পশ্চিমবঙ্গকে বাংলা বানানো কেবলমাত্র মিথ্যাচারই নয় মহাপাপ — পৃঃ ১৬

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

বাংলাদেশে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা এখন অবহেলিত — পৃঃ ১৭

৭১ বর্ষ, ২ সংখ্যা।। ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮।। ২৪ ভাদ্র - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

সংবাদমাধ্যমের সুবিধাবাদী চরিত্র বদল

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ২ সংখ্যা, ২৪ ভাদ্র, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১০ সেপ্টেম্বর - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

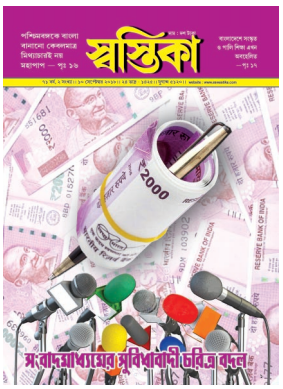

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

মমতা সরকারের পেনশন প্রতারণার জবাব দিন অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ সাংবাদিকরা ▯ গূঢ়পুরুষ **▯ ৬**

খোলা চিঠি : জন্মাষ্টমী জমিয়ে দিলেন দিদির কেষ্ট ▯ সুন্দর মৌলিক **▯ ৭**

ইভিএম নিয়ে কচকচানি শেষ হওয়া দরকার ▯ সৌভিক চক্রবর্তী **▯ ৮**

তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত না হলে এই মৃত্যুমিছিল থামবে না ▯ সাধন কুমার পাল **▯ ১১**

বিরোধী রাজনীতিতে উপেক্ষিত জাতীয় স্বার্থ ▯ চন্দ্রভানু ঘোষাল **▯ ১৩**

বর্তমান সময়ে একক নির্বাচন নানা কারণে প্রয়োজন ▯ শুভদীপ সেন **▯ ১৫**

পশ্চিমবঙ্গকে 'বাংলা' বানানো মহাপাপ ▯ ড. জিষ্ণু বসু **▯ ১৬**

বাংলাদেশে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা এখনও অবহেলিত ▯ ১৭

লে লে বাবু ছ'আনা ▯ আদিনাথ ব্রহ্ম **▯ ২৩**

লিবারেল সাংবাদিকদের নরেন্দ্র মোদী বিদ্বেষ— কিছু কথা ও কিছু কাহিনি ▯ নিবারণ চক্রবর্তী **▯ ২৬**

পাথুরিয়াঘাটা মল্লিক বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধি উৎসব ▯ সপ্তর্ষি ঘোষ **▯ ৩১**

প্রণাম আমিত্বের নাশ করে ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার **▯ ৩২**

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত ▯ সলিল গেঁউলি **▯ ৩৩**

গল্প : লক্ষ্মীর আগমন ▯ কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় **▯ ৩৫**

খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের কান্ডকারখানা একটি বিপজ্জনক ধারা ▯ পুলকনারায়ণ ধর **▯ ৪৩**

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯

সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ এইসময়, সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০ ▯

চিত্রকথা : ৪০ ▯ খেলা : ৪১▯ রঙ্গম : ৪২ ▯

সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
১৭ সেপ্টেম্বর,
২০১৮

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৭ সেপ্টেম্বর,
২০১৮

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

এরা বুদ্ধিজীবী না হননজীবী?

সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের পুলিশ কয়েকজন মাওবাদী বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছিল। পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাদের গৃহবন্দি করে রাখা হয়। এই নিয়ে তথাকথিত বাম বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদে মুখর। প্রশ্ন হলো, যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তারা সত্যিই কি মাওবাদী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত নন? তাহলে তাদের কেন গ্রেপ্তার করল পুলিশ? নাকি বাম বুদ্ধিজীবীরা এভাবে পথে নেমে অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা করছেন? পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ে নকশাল নেতা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষণজী যখন মারা যান, তখন বর্তমানে গৃহবন্দি ভারভারা রাও এসেছিলেন কিষণজীর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য।

এসব নিয়ে লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

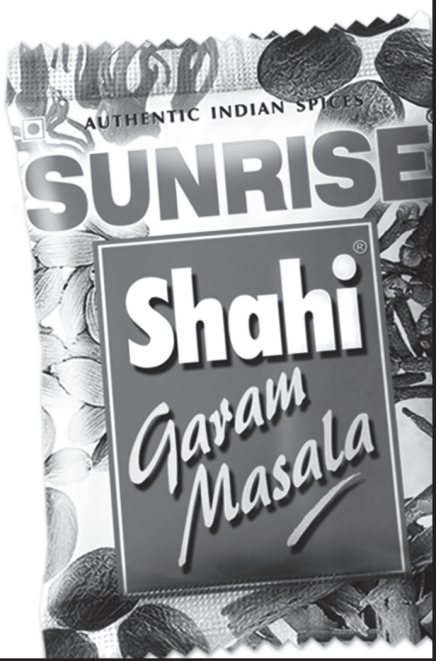

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দিদির কথা, কেষ্টা বলেন

দিদি বলিয়াছিলেন তাঁহার স্নেহের কেষ্টার মাথায় মাঝেমধ্যেই অক্সিজেনের অভাব ঘটে। আর যখনই অক্সিজেনের অভাব ঘটে তখনই কেষ্টা নানাবিধ অমৃতবচন বিতরণ করেন। কেষ্টার মুখনিঃসৃত এইসব অমৃতবচনের ভিতর 'চড়াম চড়াম ঢাক বাজানো' এবং 'গুড়জল' খাওয়ানোর সদুপদেশ এদেশে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দিদি অবশ্য স্নেহের কেষ্টার এমন সব বজ্রনিনাদের ভিতর অন্যায় কিছু দেখেন নাই। একে তো তিনি তাহাকে স্নেহ করেন, তদুপরি তাহার মাথায় অক্সিজেন ঢোকে না। অতএব, কেষ্টার কথায় কাহাকেও রুষ্ট হইতে দিদি মানা করিয়াছেন। কিন্তু মাথায় অক্সিজেনের ঘাটতি আছে বলিয়াই কেষ্ট যে নিছক কথার কথা কহেন—বিষয়টি এমনও নহে। কেষ্টা প্রমাণ করিয়াছেন, তিনি এক কথার মানুষ। আর পাঁচজন রাজনীতিকের ন্যায় বলেন এক আর করেন এক—কেষ্টা এমনটি মোটেই নন। বরং, তিনি যাহা বলেন, তাহাই করিয়া দেখান। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেই কেষ্টা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন 'চড়াম চড়াম ঢাক বাজানো' আর 'গুড়জল খাওয়ানো' নিতান্তই কথার কথা ছিল না। ওই সময়ই তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছিলেন, ভবিষ্যতেও তিনি যাহা বলিবেন—তাহাই করিয়া দেখাইবেন।

সম্প্রতি এহেন কেষ্টা, ওরফে অনুব্রত মণ্ডল, তাঁহার বাণীর আরও কিছু নমুনা পেশ করিয়াছেন। বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির একটি বৈঠকে, জনৈকা বিরোধী রাজনৈতিক নেত্রীকে গাঁজা কেস দিয়া পুলিশি লকআপে ঢুকাইবার হুমকি দিয়াছেন। বলিয়াছেন, 'একে গাঁজা কেসে ফাঁসিয়ে দে।' শুধু বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার এই নির্দেশ যাহাতে কার্যকর হয়, তাহার জন্য তৎক্ষণাৎ পুলিশ কর্তাদের বার্তা দিতেও সক্রিয় হইয়াছেন। তৃণমূল জেলা কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে কেষ্টার এই বীরত্বপূর্ণ আচরণের ভিডিও ক্লিপিংস ইতোমধ্যেই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি, এক্ষেত্রেও কেষ্টা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবিলম্বে করিয়া দেখাইবেন। ওই বিরোধী রাজনৈতিক নেত্রীকে গাঁজা না হোক, অন্য কোনও কেসে ফাঁসাইয়া দেওয়া হইবে। তাহা না হইলে, কেষ্টার ক্ষমতার যথাযথ প্রদর্শন হইবে না। বেয়াড়া বিরোধীদের সমঝাইয়া দেওয়াও যাইবে না।

তবে কেষ্টাকে ধন্যবাদ দিতেই হইবে। দিতেই হইবে এই কারণেই যে, তিনি শাসক দলের রাজনৈতিক সংস্কৃতিটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। দলীয় বৈঠকে বসিয়া, প্রশাসনকে ব্যবহার করিয়া একজন বিরোধী রাজনৈতিক নেত্রীকে ফাঁসাইয়া দিবার সংস্কৃতিই যে এই রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তাহা বীরভূমের কেষ্টা বুঝাইয়া দিয়াছেন। বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের অনেক স্থানেই মিথ্যা মামলায় ফাঁসাইয়া দিয়া হেনস্থা করা হইতেছে—এই অভিযোগ রাজ্যের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি দীর্ঘদিন হইতেই করিয়া আসিতেছিল। অভিযোগ যে মিথ্যা ছিল না—কেষ্টা নিজের আচরণে তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে কেষ্টার বীরভূমেরই বহু বিজয়ী বিজেপি প্রার্থী অন্য রাজ্যে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় চড়াম চড়াম ঢাক বাজাইয়া কেষ্টা প্রমাণ করিয়াছিলেন—তাহাদের শাসন আমলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন কার্যত এক ঠুঁটা জগন্নাথ। এইবার প্রমাণ করিলেন, পুলিশও কার্যত এক দলদাস। দলদাস বলিয়াই মিথ্যা মামলায় বিরোধী নেতা-নেত্রীদের ফাঁসাইয়া দিবার নির্দেশ অনায়াসেই পুলিশকে দেওয়া যায়।

এমন ভাবিবার কোনো কারণ নাই যে, দিদির স্নেহের কেষ্টা আপন মনে, আপন ভাবে এই কথাগুলি বলিতেছেন। কেষ্টা বলিতেছেন সত্য, কিন্তু দিদি যাহাতে খুশি হন—এমন কথাই কেষ্টা বলিতেছেন। মনে রাখিতে হইবে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে চড়াম চড়াম ঢাক শুধু কেষ্টার বীরভূমেই বাজে নাই। সর্বত্রই বাজিয়াছে। শুধু কেষ্টার বীরভূমে নয়, সর্বত্রই মিথ্যা কেসে ফাঁসাইয়া দিবার রাজনীতি চালু হইয়াছে। কাজেই কেষ্টার কথা যে শেষ পর্যন্ত দিদিরই কথা—এই উপসংহারে পহুঁছাইতে হইবেই। দিদি যা ভাবেন, কেষ্টা তাহাই বলেন। অন্য কিছু বলেন না।

সুভাষিতম্

আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনং চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্মো হি তেষামধিকোবিশেষঃ ধর্মেন হীনা পশুভিঃ সমানাঃ।।

আহার নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন—এগুলি পশু ও মানুষদের সমান। মানুষের মধ্যে বিশেষ হলো ধর্ম। ধর্মহীন মানুষ পশুর সমান।

মমতা সরকারের পেনশন প্রতারণার জবাব দিন অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ সাংবাদিকরা

মমতার রাজনীতির সঙ্গে সিপিএমের রাজনীতির প্রচুর মিল খুঁজে পাই। প্রতারণা, ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজ্যের জনগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ভোটে জিতে আসাটা সিপিএম অভ্যাসে পরিণত করেছিল। মনে আছে, ৮০-র দশকে চুরি, জোচ্চুরি ধরা পড়লেই তখনকার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু হরিদাস দাস তদন্ত কমিশন বসিয়ে দুর্নীতির অভিযোগকে ধামাচাপা দিতেন। এমন সময় গেছে যখন বৃদ্ধ হরিদাসবাবু এরসঙ্গে তিনটে তদন্ত কমিশন চালিয়েছেন। জ্যোতিবাবু ব্যক্তিগত ভাবে হরিদাসকে পছন্দ করতেন। কারণ তিনি তদন্ত কমিশনের কাজ শেষ করতেন না। দশ-বারো বছর বাদে তিনি যখন খসড়া প্রাথমিক রিপোর্ট জ্যোতিবাবুকে দিতেন তা গোপন রাখাটাই সেকালে রেওয়াজ ছিল। অথচ দেশের আইন বলছে যে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট বিধানসভার অধিবেশন চলাকালে ফ্লোরে পেশ করাটা বাধ্যতামূলক। জ্যোতিবাবু এবং তাঁর দলের বিধায়করা ক্ষমতায় থাকার সুবাদে দেশের সংবিধানের নির্দেশ কোনওদিন মেনে চলেননি। কারণ কমিউনিস্টরা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন। আজও তাঁরা সর্বহারার সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই প্রকৃত স্বাধীনতা আসে এমন রূপকথায় বিশ্বাস করেন। ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ডের মাওবাদীরাও একই তত্ত্বে বিশ্বাস করে। অথচ মার্কসবাদী এবং মাওবাদী কমিউনিস্টদের সাপে-নেউলে সম্পর্ক। এর কারণ তাত্ত্বিক আদর্শ নয়। বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্টরা বাক্তিস্বার্থে রাজনীতি করেন। আদর্শের বদলে ক্যাশ টাকাটা ভোগ করতে পারলে প্রকৃত কমিউনিস্ট হতে পারেন।

মমতার রাজনীতির ধরনটাও একই রকম। দলের মধ্যে আর্থিক দুর্নীতি বিপুলভাবে প্রবেশ করেছে কথাটা মমতার অজানা নয়। অথচ দুর্নীতি বন্ধ করার বদলে তিনি বেশি সময় খরচ করেন সংবাদমাধ্যমে তার সমালোচনা বন্ধ করতে। সম্প্রতি স্বস্তিকায় প্রবন্ধ লেখক নিবারণ চক্রবর্তী তথ্য সহযোগে জানিয়েছেন কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত সম্পাদক-সাংবাদিকদের পদত্যাগে বাধ্য করেছেন, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেছেন। সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকদের মমতা বেজায় অপছন্দ করেন। বিশেষত বাম আমলে

গূঢ়পুরুষের কলম

যেসব সাংবাদিক সিপিএমের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করেছেন। অবসরপ্রাপ্ত এবং আর্থিকভাবে দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করা সেই অকুতোভয় সাংবাদিকদের পেনশনের নামে 'এপ্রিল ফুল' করতে মুখ্যমন্ত্রীর বিবেকে বাধে না। এই প্রসঙ্গে আমার আগের লেখা একটি সংশোধন করে নিই। মুদ্রণ প্রমাদের জন্য কয়েক সপ্তাহ আগে গূঢ়পুরুষের কলমে ছাপা হয় অবসরপ্রাপ্ত, দুঃস্থ, অসুস্থ সাংবাদিকদের মাসিক চারহাজার পাঁচশো টাকা পেনশন দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় ঘোষণা করেছিলেন। সঠিক তথ্য হচ্ছে, সাংবাদিকদের মাসিক পেনশন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল দু'হাজার পাঁচশো টাকা, যা এখনও বিশ বাঁও জলের তলায়। মমতার প্রতারণার এই স্টাইলটাও অতীতে সিপিএমের দেখানো পথে। গত ২০১১ সালে বিধানসভার নির্বাচনের ঠিক আগে ক্ষমতালোভী বামফ্রন্টের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত কলকাতা প্রেস ক্লাবে বড়ো অনুষ্ঠান করে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সাংবাদিকদের মাসিক দুই হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এই ব্যাপারে সরকারি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ভাতা দেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত বলি, সেই সময় তৃণমূল নেত্রী অসীমবাবুর ঘোষণাকে অসত্য, প্রতারণা ইত্যাদি বলেছিলেন। এমন কথাও নেত্রী তখন বলেছিলেন যে, নির্বাচনে জিতে সরকার গড়লে তিনি চরম দারিদ্র্যে দিন কাটানো বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের 'সমাজসেবী' হিসেবে মাসিক দশহাজার টাকা ভাতা দেবেন। নেত্রী দশটাকাও দেননি। তারপর চলতি বছরের মার্চ মাসের শেষ দিকে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে মুখ্যমন্ত্রীর অধীনস্থ তথ্যদপ্তর জানায় যে, 'কোনও রকম রোজগার নেই এমন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সাংবাদিকদের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে মাসিক দুই হাজার পাঁচশো টাকা ভাতা ১ এপ্রিল ২০১৮ থেকে দেওয়া হবে। তবে সেই ভাতা পাওয়ার আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে আবেদনকারী অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিককে ব্যক্তিগতভাবে লিখিত গ্যারান্টি দিতে হবে যে, আবেদনকারী সাংবাদিক অবসরপ্রাপ্ত এবং তাঁর জীবনধারণের জন্য কোনও রোজগার নেই। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে আবেদনকারী বৃদ্ধ সাংবাদিককে সরকারি প্রেস কার্ডের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। অথচ সরকারি আইনেই বলা আছে যে, অবসর গ্রহণের পর সাংবাদিকদের সরকারি প্রেস কার্ড তথ্যদপ্তরে ফেরত দিতে হবে। ফলে প্রায় একযুগ পরে সেই প্রেস কার্ডের প্রতিলিপি কীভাবে দেওয়া সম্ভব। বলে রাখা ভালো যে, ভারতে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই সাংবাদিকদের অবসরকালীন ভাতা দেওয়া হয় না। বিজেপি শাসিত ২০টি রাজ্যে অবসরপ্রাপ্ত দরিদ্র সাংবাদিকদের সমাজসেবার স্বীকৃতি-সহ অবসরভাতা দেওয়া হয়। এরজন্য শাসক দলের পদলেহন করতে হয় না। প্রবীণ সাংবাদিকদের কাছে আমার ব্যক্তিগত আবেদন যে, অসম্মানিত হয়ে আপনারা নেত্রীর ছুঁড়ে দেওয়া ভিক্ষার দান প্রত্যাখ্যান করুন। কর্মজীবনে যদি আপনারা মাথা উঁচু করে সাংবাদিকতা করে থাকেন তবে আজ বিদায় বেলার শেষলগ্নে ভিক্ষার দান নেবেন না। নিলে আত্মবিক্রয় করা হবে।■

জন্মাষ্টমী জমিয়ে দিলেন দিদির কেষ্ট

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান

দিদি, ভিডিয়োটা দেখেছেন? ওই যে জন্মাষ্টমীর দিন আপনার কেষ্টভাইয়ের ভিডিয়োটা। ওই যে গাঁজা ভিডিয়োটা। দিদি, আপনি বলেছিলেন ওঁর মাথায় কম অক্সিজেন যায়, কিন্তু এ তো দেখা যাচ্ছে গাঁজার ধোঁয়াও ঠিক ঠাক যায়। তাই তো গাঁজা নিয়ে কথা বলার পরে নিজেই তিনি বলেছেন ওসব ভিডিয়ো নাকি নিছকই গাঁজাখুরি।

দিদি, আপনি ভাইয়ের বাণী শুনেছেন জানি। তবু একবার পড়ে নিন–- "ওই ফাইভ ম্যান কমিটি থেকে একজনকে বাদ দিলাম না?... ওই ছেলেটাকে, ওকে অ্যারেস্ট করিয়ে দে। ওই যে মেয়েটার কী নাম? মোটা করে মেয়েটা। কাপড়ের দোকান আছে। ... সংগীতা (কেউ মনে করিয়ে দেওয়ার পরে)। ও বিজেপি করে। ওকেও অ্যারেস্ট করিয়ে দে গাঁজা কেসে।" আর তারপরেই পাশের পাশের সিটে বসে থাকা বীরভূমের জেলা তৃণমূল সহ-সভাপতি অভিজিৎ সিংহকে বলেন–- " আইসিকে ধর তো। বর্ধমানের এসপিকেও ফোন কর।" সামনের দিকে অনুব্রত ফের প্রশ্ন করেন–- "ওঁদের কন্ট্রেল করতে পারবি কি? কন্ট্রোল করতে পারলে বল, না হলে অ্যারেস্ট করিয়ে দেবো। কে আছিস রে? পারবি কন্ট্রোল করতে?" সামনের দিক থেকে উত্তর আসে, হ্যাঁ চেষ্টা করছি।" তাতে ফের মেজাজ হারিয়ে অনুব্রতর উত্তর, " ওসব চেষ্টা চলবে না। হ্যাঁ কি না? উত্তর চাই।"

দিদি, আপনি আমার সম্মাননীয় দিদি। তাই অনুব্রতবাবুর বলা খিস্তিগুলো উল্লেখ করলাম না। কিন্তু দিদি একটা কথা মাথায় রাখবেন যে, অনুব্রত মণ্ডলের মাথায় মোটেও অক্সিজেন কম ঢোকে না। কারণ যেভাবে উনি পালটি খেয়েছেন তা দেখে হাততালি দিতেই হবে।

অতসব কথা গোটা রাজ্য ওনার বিখ্যাত গলায় শুনে ফেলার পরে উনি বলেন সবটাই নাকি জাল ভিডিয়ো। ওই সেই আপনি যেমন বলেছিলেন নারদকাণ্ডের ভিডিয়ো নিয়ে। সাবাই দেখল আপনার এক ডজন ভাই গেঞ্জি গায়ে, তোয়ালে মুড়ে নানাভাবে টাকার বান্ডিল নিচ্ছে আর আপনি দেখলেন বিজেপির চক্রান্ত। ঠিক সেইটাই বলেছেন কেষ্টদা।

রবিবার বোলপুরে দলীয় কার্যালয়ে জেলা কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। সেখানেই বর্ধমানের আউসগ্রামে তৃণমূল থেকে বিজেপি ঘেঁষা দুই কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। ওই বৈঠকে ছিলেন আউসগ্রামের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক অভেদানন্দ খাণ্ডার। তাঁকে উদ্দেশ্য করেই অনুব্রতকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিতে শোনা যায়। কিন্তু পরে অনুব্রত মণ্ডল বলেছেন, " আউসগ্রামে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় নামে আমাদের এক কর্মী খুন হয়েছিলেন। সেই খুনিদের ধরিয়ে দেওয়ার কথা বলছিলাম।"

পালটি দেখে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, কিন্তু আপনাকে তো 'গাঁজা কেস' দেওয়ার কথা বলতে শোনা গিয়েছে। অনুব্রত মণ্ডল বলেন, " ওই খুনিরা এখন গাঁজার ব্যবসা করে। সেই কারণেই গাঁজা কেসে অ্যারেস্ট করার কথা বলেছি। এতে ভুলটা কী আছে?"

বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতির মুখে ওই ভিডিয়োয় জয়দেব মণ্ডল নামে একজনের নাম উঠে এসেছে। কে এই জয়দেব মণ্ডল? অনুব্রত মণ্ডল জানিয়েছেন, জয়দেব মণ্ডল আউসগ্রামের সিপিএম নেতা। জয়দেব মণ্ডলের পরিবারের লোকজনের হাতেই নাকি উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় নামে এক তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছিলেন। সেই খুনিদের ধরিয়ে দেওয়ার কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন বলে অনুব্রতর দাবি।

কিন্তু সংগীতা চক্রবর্তী তো সিপিএম করতেন না। তিনি খুনও করেননি, গাঁজার ব্যবসাও করেন না। তাহলে সংগীতাকে গাঁজার কেসে গ্রেপ্তার করানোর কথা বললেন কেন? বিজেপি করে বলে গাঁজার কেস দিতে হবে? দিদি, এমন প্রশ্নের উত্তরে জাস্ট ফাটিয়ে দিয়েছেন অনুব্রতদা। সত্যি আপনারই ভাই বটে! দিনকে রাত করতে আর কজন পারে বলুন?

সংগীতা প্রসঙ্গে অনুদাদা বলেছেন, "কে সংগীতা? কোনও সংগীতা-ফংগিতাকে চিনি না।" কিন্তু ভিডিয়োতে যে দেখা গিয়েছে আপনি সংগীতা নামে কোনও একজনকে গ্রেপ্তার করানোর নির্দেশ দিচ্ছেন। অনুব্রত বললেন, "ওসব ফালতু, রং চড়ানো ভিডিয়ো। কে কী ভিডিয়ো ছড়িয়েছে, দেখিনি। দেখার ইচ্ছাও নেই। আমার মুখে কী কথা বসানো হয়েছে, জানি না। ওসব ভিডিয়োয় কে কী দেখাল, তাতে কিছু যায় আসে না।"

সত্যিই তো কী যায় আসে। মাথার উপরে আপনার হাত থাকলে কে কী করবে। কথায় বলে–- রাখে দিদি মারে কে?

—সুন্দর মৌলিক

ইভিএম মেশিন নিয়ে কচকচানির শেষ হওয়া দরকার

অতিথি কলম

সৌভিক চক্রবর্তী

আগামী লোকসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিপজ্জনক বিতর্কটি শুরু হতে চলেছে তা একই সঙ্গে নিতান্তই অর্থহীনও বটে। বিষয়বস্তু সেই একই ইভিএমের মাধ্যমে ভোট কি সঠিক নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ করবে?

এই জন্যই বলছি যে, এই বিতর্ক বিপজ্জনক, কেননা তা বিশ্বের সব বৃহৎ গণতন্ত্রের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকেই অবৈধতার মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। আবার এই বিতর্ক যে অর্থহীন ও কুযুক্তিতে ভরা তার উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে লালুপ্রসাদ যাদব যদি বলেন যে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল না, তারই মতো অবান্তর।

এরই মধ্যে সর্বোচ্চ আদালতে দাখিল করা আবেদনগুলি গৃহীত হওয়ায় তার শুনানিও শুরু হওয়ার কথা। অবশ্যই দেশের প্রধান প্রধান বিরোধী দলের তরফে আদালতে ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ, অভিযোগ কিছু থাকলে, মহামান্য আদালতকে গণতন্ত্রের স্বার্থে তা শুনতেই হবে। এটাই প্রচলিত পদ্ধতি।

এটা ধরে নেওয়া যায় যে, সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ভারতবাসী এটাই চাইবে যে, আদালতের নির্দিষ্ট বেঞ্চ নিশ্চয় বর্তমানে চালু থাকা ইভিএমের মাধ্যমে ভোট গ্রহণই বহাল রাখবেন। অবশ্যই ভোট নির্দিষ্ট জায়গায় পড়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার 'ভি ভি পি এ টি' পদ্ধতিকে আরও সুদৃঢ় কীভাবে করা যায় নির্বাচন কমিশনকে সে সম্পর্কে সজাগ থাকতে নির্দেশ দেবেন। যাতে গণতন্ত্রের পক্ষে ভয়ঙ্কর এই বিতর্কে বরাবরের মতো ইতি পড়ে।

কিন্তু একটা সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে যে আদালত 'status quo' অর্থাৎ ইভিএম পদ্ধতিকেই প্রত্যাশিতভাবে বহাল রাখলেও, বিরোধীরা এটা ছাড়তে চাইবে না। লক্ষ্য করবেন, বিষয়টি সর্বোচ্চ আদালতের বিচারাধীন থাকাকালীনও ইতিমধ্যেই বিরোধী দলের নেতারা নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করে ইভিএম সম্পর্কে আবার তাদের সন্দেহ ও তথাকথিত অবিশ্বাস ব্যক্ত করে এসেছে। আর নিজেদের মধ্যে তো তারা এ বিষয়ে এককাট্টা হবার চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে।

যে সমস্ত বিরোধীদল 'Voter verified Paper Audit Trail (VVPAT)' পাওয়া যাবে এমন মেশিনের মাধ্যমেই ভোট করার ওপর জোর দিচ্ছে তারা অন্তত অর্ধেক যুক্তিধারী এটা বলা যায়। যদিও তাদের মূল দাবিটি অবশ্যই অবাস্তব।

মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩০ শতাংশ VVPAT-এর প্রমাণপত্রকে মূল মেশিনে দেয় ভোটের সঙ্গে মেলানো ৮০ কোটি ভোট দাতার দেশে এক হিমালয় সদৃশ কঠিন কাজ। নমুনা হিসেবে দেশের নানান প্রান্তে নির্বাচনী আধিকারিকদের ঘুরে ঘুরে এই কাজ সমাধা করা এক বিশালাকার কর্মকাণ্ড যা অতি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ। কিছু বিরোধী এমনই দাবি করছে। এই দাবি মেনে ভোট প্রক্রিয়া চালাতে গেলে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করাই দুষ্কর হয়ে পড়বে। সময়ের ও গণনার নির্ঘণ্ট সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। নির্বাচন আয়োগ ইতিমধ্যে হওয়া কিছু কিছু রাজ্যের ভোটের VVPAT-এর শতকরা ১ শতাংশ নমুনা পরীক্ষা করে দেখেছে। নির্বাচন আয়োগের বেশ কিছু আধিকারিক শতকরা ৫ শতাংশ অবধি নমুনা পরীক্ষা করে দেখার সুপারিশ করেছেন। এটা চেষ্টা করলে হয়তো করা যেতে পারে। আয়োগ নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরিমাণ বাড়ানোতে রাজি হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। কিন্তু কোনো পূর্ব নির্দিষ্ট সর্বত্র একই ধরনের অনুপাতে তারা রাজি নয়। কেননা তা সম্ভব নয়। তারা সঠিক যুক্তি দিয়েই বলেছে— প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের বুথ স্তরের বাস্তব পরিস্থিতির

> ইভিএম নিয়ে শুরু হওয়া অবান্তর ও বিপজ্জনক বিতর্কের মূলে আছে বিরোধীদের মধ্যে গেড়ে বসা আতঙ্ক— যদি নরেন্দ্র মোদী আবার ফিরে আসেন? ভবিষ্যতের রাজনৈতিক অসহায়তার কথা ভাবলেই তাঁরা চেঁচাতে শুরু করছেন।

ওপরই ভিভিপিএটি মেশিনের প্রয়োজন নির্ধারিত হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ৩০ শতাংশ 'ভিভিপিএটি' নমুনাকে নিরীক্ষণ করা এক বিভীষিকাময় প্রক্রিয়া। যে সমস্ত বিরোধী এটা দাবি করছে তারা নিজেরাও ভালোই জানে এই বিশাল দেশে শুধু মাত্র যাতায়াতের কারণেই তা অসম্ভব। কিন্তু বাজারে এই অন্যায় দাবিকে একবার ছেড়ে দেওয়ার পর তারা নিজেদের প্রয়োজন মতো এই মিথ্যে আবদারকে ব্যবহার করে যখন তখন শোরগোল তোলবার রাস্তা খোলা রাখতে চায়।

হ্যাঁ, এই আদ্যন্ত মিথ্যে কিন্তু শোরগোল তোলার ক্ষমতাধর বিষয়টি তুমুলভাবে উঠে আসবে যদি আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বের এনডিএ আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। আর সেই সম্ভাবনা আছে বলেই অনেকের সন্দেহ যে বিরোধীরা এই অর্থহীন ও অন্যান্য ইভিএম সংক্রান্ত বিতর্কটিকে যেনতেন প্রকারে জিইয়ে রাখতে চাইছে। বিরোধীরা ভাবছে তারা যে বিষয়টি নির্বাচনের আগে থেকেই তুলেছিল নির্বাচনের পরে তো তারা সেই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে তোলা প্রশ্নকে পুঁজি করে অনাদিকাল ধরে অরাজকতা চালাতে পারবে।

এটা ঠিকই আজকের বিজেপি যে সংখ্যায় রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচনে জয়লাভ করছে অতীতে অনেক সময়ই তারা ব্যর্থ হয়েছে। সে সময় বিজেপি নেতারাও ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু তখনকার নিতান্তই রাজনীতির ছাঁচে ঢালা সেই বিরোধিতার সঙ্গে আজকের একান্ত মরিয়া হয়ে ইভিএমের বিরুদ্ধে যে সংগঠিত তীব্র আক্রমণ চলছে তার তুলনাই চলে না।

হ্যাঁ, ২০১৭ সালে উত্তর প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে মায়াবতী সদলবলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পর যখন ঝাল মেটাতে ইভিএমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁর হতাশার মানে বোঝা যায়। এটা নতুন কিছু নয়। পরাজয়ের পর দলগুলির এমন অক্ষমের আস্ফালন আকছার দেখা যায়। কিন্তু তিলমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হাতে না থাকা সত্ত্বেও লাগাতার একটা অন্যায্য জিনিস নিয়ে লেগে থাকা অন্য ব্যাপার।

সকলেই জানেন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে পরেই বিহার ও দিল্লিতে বিজেপি রাজ্য নির্বাচনে পরাজিত হয়। গুজরাটে ফল খারাপ হয়। কর্ণাটকেও সম্প্রতি তারা গরিষ্ঠতা পেল না। সবই তো ইভিএমের মাধ্যমে নির্বাচন হয়েছে! আর এর পর উত্তর প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী-উপমুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রে সমাজবাদী-বহুজন সমাজবাদী একত্র হয়ে তাদের ওই ইভিএমের ভোট দিয়েই তো হারাল! মমতা ব্যানার্জি কী আশ্চর্যভাবে ভুলে যেতে চাইছেন যে ইভিএম মেশিনের দৌলতেই তিনি বাংলায় দ্বিতীয়বার কী বিপুল সংখ্যাই না জিতে এলেন। কিন্তু এখন তিনি কী হাস্যাস্পদ দাবি তুলে বলছেন আবার ব্যালট পদ্ধতিতেই ভোট হোক। এই স্বল্প পরিসর নিবন্ধে ব্যালট বাক্স ভোটের কেলেঙ্কারি নিয়ে সময় নষ্ট করার অবকাশ নেই। হাজার হাজার বুথে দলীয় গুন্ডারা কী অবলীলায় ভোটারকে তাড়িয়ে দিয়ে ব্যালট বাক্সগুলোতে নিজেদের পক্ষে false ভোটিং করত তা সকলেই জানেন। তাঁরা সেটাই চাইছেন?

না, এর চেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে কেন কোনও প্রমাণ ছাড়াই বিরোধী দলগুলি এমন মরিয়া হয়ে ইভিএম বিরোধিতা করছে। এ বিষয়ে শুধু কিছু অনুমানই করা যেতে পারে অবশ্যই যুক্তির ভিত্তিতে। আগামী লোকসভা নির্বাচন বহু বিরোধী দলের পক্ষেই মরণ বাঁচন লড়াই। যদি এনডিএ জেতে সেক্ষেত্রে তাদের অনেকেরই রাজনৈতিক অস্তিত্ব মুছে যাবে বা তার কাছাকাছি পৌঁছবে।

রাহুল গান্ধী, মমতা ব্যানার্জি, শরদ পাওয়ার, অখিলেশ যাদব, মায়াবতী এঁরা সকলেই পরিবার-কেন্দ্রিক দল চালান। দলের নিয়ন্ত্রণ একজনের হাতে বা পরিবারের হাতে। এই প্রথায় প্রধান অসুবিধে হচ্ছে যখন দল বড় ধরনের নির্বাচনী বিপর্যয়ের মুখে পড়ে তখনই ব্যক্তিকেন্দ্রিক দলের নেতা বা নেত্রী ভেতরে ভেতরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। দলের ভেতর বিকল্প নেতৃত্ব না থাকা বা উত্তরাধিকারী অনেক সময় সঠিকভাবে চিহ্নিত না হওয়ার কারণে একক নেতা বা নেত্রীর আওতায় থাকা দলের প্রধান ভেতরে ভেতরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনিই তো জেতাতে পারলেন না। এবার কী হবে?

মোদীর দ্বিতীয় জয় তাই বহু রাজনৈতিক জীবন খতম করে দেবে। এই কারণে আদালতের গ্রেপ্তার এড়াতে আগাম জামিন চাওয়ার মতো আগে থেকেই একনাগাড়ে কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ভবিষ্যতে নিজে বাঁচার অজুহাত খোঁজা ছাড়া কিছু নয়। বিজেপি ও এনডিএ যদি দ্বিতীয় দফায় জিতে আসে তখন রাহুল, মায়াবতী, মমতা, যাদব, পাওয়ার নিশ্চিতভাবেই সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ভোটের ফলাফলের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবেন। তাকে অলীক চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন। আর নিজেরা জনতার চোখে কিছুটা বলি হয়ে যাওয়ার অনুভব জাগাবার চেষ্টা করবেন।

বাস্তবে বিজেপি কখনই কোনো ব্যক্তি পরিচালিত দল না হওয়ায় দু'দুটি নির্বাচনে পরাজয়ের পর তারা তাদের নেতৃত্বে পরিবর্তন আনে। আর ইভিএম হারিয়ে দিল বলে ধুয়ো তোলাও তেমন উৎকট পর্যায়ে কখনই নিয়ে যায়নি, যেমন এখন বিরোধীরা করছে। বিজেপির কাছে বিকল্প নেতৃত্ব বাছার অবকাশ ছিল। পারিবারিক দলগুলির তা নেই।

উপসংহারে বলা যায় বিজেপির চলতি নেতৃত্ব দলের অভ্যন্তরে অন্যান্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও যোগ্যদের কথাও ভাববেন, দলে আলোচনার পরিসর বাড়াবেন যাকে বলে flexibility। সুসময়ে যে সমস্ত কৌশল সঠিকভাবে চলতে পারে তা খারাপ সময়ে কার্যকরী নাও হতে পারে। দুঃসময়ের রসদও তাই হাতে রাখতে হয়।

মূল প্রতিপাদ্যে ফিরে গিয়ে বলতে হয় ইভিএম নিয়ে শুরু হওয়া অবান্তর ও বিপজ্জনক বিতর্কের মূলে আছে বিরোধীদের মধ্যে গেড়ে বসা আতঙ্ক— যদি নরেন্দ্র মোদী আবার ফিরে আসেন? ভবিষ্যতের রাজনৈতিক অসহায়তার কথা ভাবলেই তাঁরা চেঁচাতে শুরু করছেন। ■

রম্যরচনা

গবার বিয়ে ঠিক হয়েছে এক মুখরা মেয়ের সঙ্গে। গবা ঠিক করল, বিয়ে করতে যাবে গাদা বন্দুক হাতে নিয়ে। বরবেশে বন্দুক হাতে গবাকে বিয়ের আসরে প্রবেশ করতে দেখেই তো বউ রেগে টং। মুখে যা নয়, তাই বলে দিল গবাকে। বিয়ে মিটলে পর গবা বায়না ধরল বেতো ঘোড়ায় বউকে চাপিয়ে বাড়ি ফিরবে। তা শুনে তো বউয়ের রাগ মাথায় উঠল। গবাকে যা-তা বলতে লাগল। গবা নির্বিকার। বেতো ঘোড়া কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নড়তে চায় না। তাই দেখে গবার বউ আবার চিল চিৎকার শুরু করে দিল। গবা শুধু গম্ভীরভাবে ঘোড়ার পিছনে চাপড় মেরে বলল— 'প্রথমবার সাবধান করছি।' ঘোড়া আবার চলতে শুরু করল। আবার কিছুদূর গিয়ে ঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়ল। গবা বলল— 'দ্বিতীয়বার...' ঘোড়া আবার চলতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর ঘোড়া আবার দাঁড়িয়ে পড়লে গবা বলল— 'তৃতীয়বার...' বলেই গাদা বন্দুক থেকে দুম করে গুলি করে ঘোড়াকে মেরে ফেলল।

মুখরা বউ এসব দেখেশুনে আর থাকতে না পেরে যাচ্ছেতাই বলতে শুরু করল গবাকে। গবা কিছু বলল না। শুধু বউয়ের বলা শেষ হয়ে গেলে বলল— 'একবার...' গবার বউকে আর কোনোদিন কেউ কোনো কথাই বলতে শোনেনি।

উবাচ

"আজকাল কেউ শৃঙ্খলার কথা বললে তাকে স্বৈরাচারী বলে দেগে দেওয়া হয়। কিন্তু বেঙ্কাইয়াজীর মতো মানুষ যারা নিজের জীবনে শৃঙ্খলা মেনে চলে অন্যের কাছে তা দাবি করেন, তাদের প্রতি এই আচরণ ঠিক নয়।"

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

রাজ্যসভার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে বেঙ্কাইয়া নাইডুর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে

"স্মার্ট ভিলেজ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ভারতের গ্রামগুলিকে সুখী, সমৃদ্ধ আর উচ্চমানের প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করে তোলা।"

প্রণব মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি

হরিয়ানার পাঁচটি গ্রাম দত্তক নেওয়া প্রসঙ্গে

"এই রাজ্যে (পশ্চিমবঙ্গে) এক কোটি অনুপ্রবেশকারী রয়েছে। সকলেই বাংলাদেশি। নাগরিকপঞ্জি করে এইসব লোকেদের চিহ্নিত করা উচিত।"

দিলীপ ঘোষ
বিজেপির রাজ্য সভাপতি

পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি-র প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে

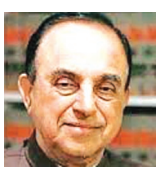

"আমরা অভিন্ন জাতি। পুরুষ ও মহিলা সব অর্থে সমান। এমনকী ব্রাহ্মণ এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর ডিএনএ-তেও কোনও ভেদাভেদ নেই।"

সুব্রহ্মণিয়াম স্বামী
বিজেপি সাংসদ

গুয়াহাটির রয়্যাল গ্লোবাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে

তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত না হলে এই মৃত্যু মিছিল থামবে না

সাধন কুমার পাল

পশ্চিমবঙ্গে আবার মৃত্যু মিছিল। এবার পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া ঘিরে। বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত গড়ার ডাক দিয়েছিল রাজ্যের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস। সেই লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত যে মৃত্যু মিছিল চলবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যতদিন দেশে আইন, আদালত ও সংবিধান আছে, ততদিন এই লক্ষ্য কোনওভাবেই পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। কারণ শাসক যতই নির্মম স্বৈরতান্ত্রিক হোক না কেন মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাবেই। এলাকা ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সমস্ত এলাকা ইতিমধ্যেই বিরোধীশূন্য বলে চিহ্নিত হয়ে গেছে, সেই সমস্ত এলাকা আরো বেশি অশান্ত। যেমন, কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমা ও সিতাই ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ বিরোধী শূন্য। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই এখানে সন্ত্রাসকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে বিরোধীরা মনোনয়ন তোলার কথাও ভাবতে পারেনি। পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার পর থেকে বিরোধী শূন্য এই দুটি এলাকা তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বোমা-গুলির লড়াইয়ে এই এলাকা থমথমে হয়ে উঠছে। বিকেল হতেই এক অজানা আশঙ্কায় মানুষ ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। সংবাদপত্রে হেডলাইন হচ্ছে 'অস্ত্র ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে সিতাই'। খোদ তৃণমূল নেত্রী অনেকবার এলাকার নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেছেন, শাসিয়েছেন, ধমকেছেন— কিন্তু পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ এতটাই হাঁপিয়ে উঠেছে যে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজনকে পর্যন্ত বলতে শোনা যাচ্ছে বিজেপি আসুক আপত্তি নেই, তবুও আমরা এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি চাই।

বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া ঘিরে এই লেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে পাঁচ জনের। আলিপুরদুয়ার থেকে ঝাড়গ্রাম একই চিত্র। আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার পারঙ্গেরপারে বিজেপির এক নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যকে সর্বসমক্ষে অপহরণ করে বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া হলে সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে বিজেপির দশ জন ও তৃণমূলের দু'জন আহত হয়। জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরে বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। জলপাইগুড়ি তৃণমূল যুবর সভাপতির অভিযোগ, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে একদল লোক লুটেপুটে খাচ্ছে।" ইসলামপুরের চোপড়া থানা এলাকার লক্ষ্মীপুরে বোর্ড গঠনকে ঘিরে ২৫ আগস্ট রবিবার রাত থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত লাগাতার বোমা ও গুলি চলে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে পুলিশ যাতে পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকতে না পারে তার জন্য পাকা রাস্তা কেটে দেওয়া হয়। লক্ষ্মীপুরে ঢোকার রাস্তা গাছের গুঁড়ি ও পাথর ফেলে বন্ধ করে দেওয়া হয়। মালদার মানিকচকের গোপালপুরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে যে গুলির লড়াই হয় তাতে মৃত্যু হয় সালাম শেখের। গুলিবিদ্ধ আজাহারের মৃত্যু হয় হাসপাতালে। পুরুলিয়ার জয়পুরের ঘাগরা গ্রামে তৃণমূলের আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় নিরঞ্জন গোপ ও দামোদর মণ্ডল নামে দুই বিজেপি কর্মীর। আহত আরও ১৪ জন।

তুলনামূলকভাবে রিগিং, দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, দলতন্ত্র গুণ্ডাবাজ কায়েমের নিরিখে তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএমকে ছাড়িয়ে গেছে।

বিজেপির অভিযোগ পুলিশের গুলিতে তাদের দুই কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি ব্লকের ভুলাভেদা অঞ্চলেও ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। বিজেপি সদস্যদের বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া হলে ওই দলের সমর্থকরা পথ অবরোধ করেন। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানোর সময় পুলিশের তিনটি বাইকে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

২ এপ্রিল মনোনয়ন পর্ব শুরুর দিন থেকেই রণভূমি হয়ে উঠেছিল রাজ্যের বিডিও অফিসগুলি। এই পর্বে মানুষ টেলিভিশনের পর্দা, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রক্তাক্ত মুখ, বোমা, গুলি, ধারালো অস্ত্র হাতে তৃণমূল কংগ্রেস-আশ্রিত দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবের ছবি, প্রকাশ্য দিবালোকে প্রশাসনিক দপ্তরের সামনে মহিলাদের শ্লীলতাহানির দৃশ্য দেখেছে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শুরুর দিকেই বাঁকুড়ার বিজেপির জনজাতি প্রার্থী অজিত মুর্মুকে কুপিয়ে খুন করল তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা। বিরোধীরা যাতে মনোনয়ন জমা দিতে না পারে সেজন্য তৃণমূল দুষ্কৃতীরা রাজ্যজুড়ে বোমা বন্দুক নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় দাপিয়ে বেড়িয়েছে।

সংবাদ মাধ্যমে দৌলতে মানুষ যতটুকু দেখেছে সেটা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। অনেক জায়গায় বিজেপির হয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার অপরাধে প্রকাশ্য দিবালোকে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ স্লোগান দিয়ে যথেচ্ছ লুটপাট চালানো হয়েছে। মূল্যবান জিনিসপত্র টাকা পয়সা গয়নাগাটি লুটেপুটে নেওয়ার পর এমন তাণ্ডব চালানো হয়েছে যে ঘরের আসবারপত্র, টিভি ফ্রিজ, রান্নাঘরের বাসনপত্র ঘরের দরজা-জানালা— কোনো জিনিসই ওদের নিশানা থেকে রেহাই পায়নি। থানায় গেলেও পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করছে। যাদের সামর্থ্য আছে একমাত্র তারাই আদালতের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করেছেন। বাকিদের নীরবে সহ্য করে যেতে

হচ্ছে এই অত্যাচার। এইগুলি কোনোটাই বিক্ষিপ্ত আঞ্চলিক ঘটনা নয়। দিনের পর দিন বিভিন্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে।

মনোনয়ন পর্বে সন্ত্রাসের ফল হিসেবে ভোটের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রেকর্ড সংখ্যক আসন দখল করেছে ক্ষমতাসীন দল। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ মিলিয়ে প্রায় ৩৪ শতাংশ আসনে এবার কোনো ভোট হয়নি। কোনো রাখঢাক নেই, শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ও পুলিশ প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে সংগঠিত হয়েছে গণতন্ত্রের এই হত্যাযজ্ঞ।

মনোনয়ন জমা দেওয়া ও প্রত্যাহার পর্বের সন্ত্রাসের পরেও যাঁরা নির্বাচনী ময়দানে টিকে ছিলেন ওঁরা হয়তো ভাবতেও পারেননি নির্বাচনের নামে প্রহসন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে মানুষ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস, বোমাবাজি, ভোটলুট, ভোটবাক্সে আগুন দেওয়ার মতো অসংখ্য ঘটনা দেখেছে। নির্বাচনের দিনই মৃত্যু হয়েছে মোট ১৭ জনের। সমস্ত অভিযোগই শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কিন্তু নির্বাচনের দিন যে ঘটনাগুলি লোকচক্ষুর আড়ালে হয়েছে সেগুলি আরও মারাত্মক। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত ৫৯ বছর বয়সি একজন শিক্ষক নির্বাচন থেকে ফিরে এসে বললেন জীবনে অনেক নির্বাচন করেছেন, কিন্তু কখনো এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হননি। নির্বাচনের আগের দিন বুথে পৌঁছতেই নাকি কিছু লোক নিজেদের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী পরিচয় দিয়ে সমস্ত ব্যালট পেপার তাদের হাতে দিয়ে দিতে বলে। ওদের বক্তব্য ছিল নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটি আধিকারিক নাকি ওদের। এই নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। সেই সঙ্গে আশ্বাস দেয় ব্যালট পেপারগুলিতে ছাপ দিয়ে নির্বাচনের দিন ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়ে যাবে এবং সেদিন বুথে কোনও ভোটার ভোট দিতে যাবে না। এই টিমে পোলিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত একজন প্রাথমিক শিক্ষক সামান্য প্রতিবাদ করাতে ওরা 'ফল ভুগতে হবে' বলে হুমকি দিয়ে যায়। ভোটের দিন সকালবেলা এসে ওরা সমস্ত ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়ে বুথ ঘিরে বসেছিল এবং দিনভর একজন ভোটারও বুথে ভোট দিতে আসেনি। নিয়মমাফিক সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করে মাস্টার মশাই ব্যালট বাক্স জমা দিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচেন। ভোটের দুই দিন পরে সেই প্রতিবাদী প্রাথমিক শিক্ষককে বাড়ি থেকে অনেক দূরে একটি জায়গায় বদলি করে দেওয়া হয়।

নির্বাচন সামগ্রী জমা ও সংগ্রহ কেন্দ্রে নির্বাচন কর্মীদের নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের গল্পে যারা কান পেতেছেন তাদের কাছে এটা স্পষ্ট যে, যেখানে বিরোধীদের প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা ছিল, হাতে গোনা সেরকম কয়েকটি জায়গা ছাড়া সর্বত্রই অবাধ ভোটলুট হয়েছে। সর্বত্রই নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা প্রশাসনিক মেশিনারি ছিল অজানা ভয়ে গুটিয়ে থাকা নীরব দর্শক। শুধু বিরোধীরা নয় বুথে গিয়ে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ ভোটারদেরও। গণনাতেও ছিল একই চিত্র। অনেক জায়গাতে বিরোধী দলের কাউন্টিং এজেন্টকেও গণনা কেন্দ্রে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি।

নির্বাচনের ফলাফল বলছে স্থানীয় ভাবে রাজ্যজুড়েই বিরোধীরা বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে ছিল। জেলা পরিষদে মোট আসন ৮২৪টি। এই মধ্যে তৃণমূল ৭৯২টি বামফ্রন্ট ১টি, বিজেপি ২৩টি আসন, কংগ্রেস ৬টি আসন ও অন্যান্যরা ২টি আসন পেয়েছে। মোট ৩৩০টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে তৃণমূলের দখলে গেছে ৩০৭টি, বিজেপির ১০টি, কংগ্রেস ১টি ও ১৩টি অন্যান্যদের দখলে গেছে। ২৯৩৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে তৃণমূল ২৬৭৮টি, বিজেপি ২০২টি, বামফ্রন্ট ২৪টি, কংগ্রেস ১৬টি ও অন্যান্যরা ১৩টি দখল করেছে।

ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই কোথাও প্রাণের ভয় কোথাও অর্থের লোভ দেখিয়ে অনেক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে তৃণমূল কংগ্রেস যোগদানে বাধ্য করা হয়েছে। যাদেরকে কোনও ভাবেই দমিয়ে দেওয়া যায়নি তারা যাতে বোর্ড গঠন করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যই এত সন্ত্রাস। তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে নির্বাচনে রিগিং, দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, দলতন্ত্র গুণ্ডাবাজ কায়েমের নিরিখে তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএমকে ছাড়িয়ে গেছে। অবশ্য সিপিএম ক্ষমতায় থাকলে নিশ্চিত ভাবে এরকমই করতো।

বিরোধীশূন্য করতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের সামনের সারিতে নিয়ে আসার ফল হিসেবে পুরো দলটাই যে দুষ্কৃতীদের হাতে চলে যাচ্ছে সেরকম খবর ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছে। যেমন, তৃণমূল নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য করে দলেরই যুব গোষ্ঠী গত ২৮ আগস্ট কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার গিতালদহ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে পুলিশের খাতায় ফেরার আবুয়াল আজাদ নামে এমন এক ব্যক্তিকে বসিয়েছে, যার নামে কম করে ৩০টি মামলা রয়েছে। ওই এলাকার তৃণমূল বিধায়ক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'তৃণমূল কর্মী খুন-সহ বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত একজন প্রধান নির্বাচিত হলেন। অথচ পুলিশ কিছুই করল না। এই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের দাবি আমরা বহু আগেই জানিয়ে ছিলাম।'

প্রশ্ন হচ্ছে গ্রামপঞ্চায়েত বা পুরসভাগুলি দখল করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস এতটা মরিয়া কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনি মেশিনারি বিশ্লেষণ করতে হবে। ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন ও তার আগে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভালো ফল করার পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে গ্রামপঞ্চায়েত বা পুরসভাগুলি। ১০০ দিনের কাজ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা , আই এসডিপিপি স্কিমের বরাদ্দ, এমপি ও এমএলএ ফান্ড থেকে শুরু সমস্ত কেন্দ্রীয় বরাদ্দগুলি এমন ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে যে, নির্বাচনের মুখে আমজনতার কাছে গ্রামপঞ্চায়েত বা পুরসভা কল্পতরুর মতো হয়ে উঠেছিল। কাজের হিসেব বা জনহিত নয় 'নেতা কমিশন' ও নির্দেশ অনুসারে ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতিই হয়ে উঠে বিভিন্ন স্কিমের অর্থ বিতরণের মাপকাঠি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে ঠিক নির্বাচনের মুখে গ্রাম পঞ্চায়েত বা পুরসভাগুলির নয়ছয় বন্ধ হয়ে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসের নিশ্চিত পরাজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না। ■

বিরোধী রাজনীতিতে উপেক্ষিত জাতীয় স্বার্থ

চন্দ্রভানু ঘোষাল

নীতি আয়োগ যখন এক দেশ এক নির্বাচন বিধি প্রয়োগের সুপারিশ করল তখন সব থেকে বেশি আপত্তি এসেছিল কংগ্রেসের কাছ থেকে। কংগ্রেসের সঙ্গে সুর মেলায় কয়েকটি আঞ্চলিক দলও। কারণ হিসেবে বলা হয়, এক দেশ এক নির্বাচন ব্যবস্থাটি কৃত্রিম। ভারতীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে এবং সাধারণ ভারতীয়দের মানসিকতার সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। কেউ কেউ আগ বাড়িয়ে এ কথাও বলেছিলেন, অচ্ছে দিনের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হওয়ায় মোদী সরকার এখন মারাত্মক চাপে। তাই ভারতের চিরাচরিত নির্বাচন প্রক্রিয়া ঘুলিয়ে দিয়ে স্বৈরাচার কায়েম করার চেষ্টা করছে। বস্তুত বিরোধীদের তোলা যুক্তিগুলি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। এবং মিডিয়ার কল্যাণে ফুলেফেঁপে তা পৌঁছেও গেছে ঘরে ঘরে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই কারণগুলিই কি আসল কারণ? বিরোধীরা কেন বিধানসভা এবং লোকসভার ভোট এক সঙ্গে হোক চায় না, তার প্রকৃত কারণটিকে কোনওভাবে আড়াল করা হচ্ছে না তো?

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী শপথ নেওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিটি ইস্যুতেই বিরোধীরা প্রতিবাদ করেছে। জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে গৃহীত প্রকল্প যেমন স্বচ্ছ ভারত মিশন, জনধন প্রকল্প, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও— কিছুই বাদ যায়নি। এমনকী সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং তিন তালাক বিরোধী বিলের বিরুদ্ধেও বিরোধীরা সরব হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় জাতীয় স্বার্থ নিয়ে রাহুল গান্ধীদের বিশেষ মাথাব্যথা নেই। ন্যায়নীতির তোয়াক্কা না করে তাঁরা শুধু চান ক্ষমতার বৃত্তে ঢুকে পড়তে। এক দেশ এক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্য শুধু ক্ষমতার মোহ নয়, অর্থনৈতিক কারণও আছে।

কিছুদিন আগে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে জানা যাচ্ছে, কর্ণাটকের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি ১০,৫০০ কোটি টাকা খরচ করেছে। ভোট প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যাদের ন্যূনতম জ্ঞান আছে তাঁরা জানেন, নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি যে খরচ করে তার একটা বিরাট অংশ স্থানীয় নেতা এবং প্রার্থীদের পকেটে যায়। ব্লকে-ব্লকে তারাই ভোট-মেশিনারিকে পরিচালনা করেন, সুতরাং টাকা এই খাতেই খরচ হওয়ার কথা। হয়ও। কিন্তু নেতারা দলের ফান্ড এবং নিজের পকেটও ভরে থাকেন। নির্বাচন শেষ হবার পর কোনও কোনও নেতার ব্যাঙ্কব্যালান্স বেশ ভালোই ফুলে ফেঁপে ওঠে। সুতরাং নির্বাচন যত ঘন ঘন হবে ফুলে ফেঁপে ওঠার সম্ভাবনাও তত বাড়বে। বিধানসভা ও লোকসভার নির্বাচন যদি এক সঙ্গে হয় সে গুড়ে বালি! আপত্তির একটা বড়ো কারণ এটা।

এরপর আছে নির্বাচনী অনুদান। যদিও মোদী সরকার সর্বোচ্চ অনুদানের অঙ্ক নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, কিন্তু সে নিয়ম কতটা

মানা হয় তা নিয়ে সন্দেহ আছে। সন্দেহের কারণ অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডি আর) প্রকাশিত সাতটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের আয়-ব্যয় (২০১৬-১৭) সম্পর্কিত তথ্য। ক্ষমতায় থাকার কারণে বিজেপি অনুদান এবং অন্যান্য সূত্র-বাবদ বেশি আয় করবে সেটা বলাই বাহুল্য। এডিআর-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ওই অর্থবর্ষে সাতটি রাজনৈতিক দলের উপার্জন প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা। ব্যয় ১৩০০ কোটি টাকা। লক্ষণীয়, দেশের মাত্র একটি প্রদেশের শাসনক্ষমতায় থাকলেও সিপিএমের উপার্জন বিজেপির প্রায় সমান। মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক দলগুলি যা রোজগার করে তার সিংহভাগ আসে নির্বাচনী অনুদান বাবদ। নির্বাচনী অনুদান করমুক্ত। ছোটোবড়ো বহু ব্যবসায়ী কালো টাকা সাদা করার জন্য এই পন্থাটি বেছে নেন। সুতরাং লোকসভা এবং বিধানসভার ভোট একসঙ্গে হলে অর্থাৎ নির্বাচনের সংখ্যা কমে গেলে ব্যবসায়ীদেরও ক্ষতি, রাজনৈতিক দলগুলিরও ক্ষতি। আপত্তি সেই কারণেও।

রাজনৈতিক দলগুলির আর একটি অভিযোগ বিধানসভা এবং লোকসভার ভোট একসঙ্গে করানোর প্রক্রিয়াটি কৃত্রিম। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, দেশের বিরোধী নেতাদের স্মৃতিশক্তি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাঁদের মনে করিয়ে দেবার জন্য কিছু তথ্যের আদানপ্রদান করা যেতে পারে। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সব নির্বাচনই হয়েছে একসঙ্গে। ১৯৬৭-র পর, নিজের গদি অক্ষত রাখার কারণে এবং কংগ্রেস দলটির দলগত সত্তা মুছে দিয়ে একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ইন্দিরা গান্ধী আঞ্চলিক রাজনীতিতে ইন্ধন জোগানো শুরু করেন। সেই অঙ্ক মেনেই সাধারণ নির্বাচন এবং বিধানসভার নির্বাচনগুলিকে আলাদা করে ফেলা হয়। সুতরাং এদেশে এক দেশ এক নির্বাচন বিধি কৃত্রিম তো নয়ই, নতুনও নয়।

বস্তুত এক দেশ এক নির্বাচন বিধি বিজেপির পরিকল্পনা বলে যে প্রচার চলছে তাও ঠিক নয়। এই প্রথা ফিরিয়ে আনার জন্য ১৯৮২ সালে নির্বাচন কমিশন একটি প্রস্তাব দিয়েছিল। তখন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। এরপর ১৯৯৯ সালে ল' কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান জাস্টিস বি.পি. জীবন রেড্ডি একটি রিপোর্টে বলেন, 'যত দ্রুত সম্ভব লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন একসঙ্গে করার কথা আমাদের ভাবতে হবে।' রিপোর্টে বলা হয় প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচন এবং প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন করা উচিত। ল' কমিশনের চেয়ারম্যানের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার এস. ওয়াই. কুরেশি। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এটা করা কোনও ব্যাপারই নয়। ভোটার এক, ভোটকেন্দ্র এক— এমনকী নিরাপত্তার ব্যবস্থাও আলাদা করে কিছু করতে হবে না— সুতরাং অসুবিধেটা কোথায়? একবার ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করার পর কতগুলো নির্বাচনের জন্য ভোট দিচ্ছেন কোনও ভোটারই তাই নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। সমস্যা শুধু একটাই। ইভিএম মেশিনের সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।'

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, সব নির্বাচন একসঙ্গে করার মতো পরিকাঠামো তাদের নেই। কথাটি কতদূর গ্রহণযোগ্য তাই নিয়েও সংশয় থেকে যায়। কারণ এস. ওয়াই কুরেশির আমলে যদি বাড়তি কিছু ইভিএম মেশিন কেনা ছাড়া আর কোনও সমস্যা না থেকে থাকে তা হলে এখনও থাকা উচিত নয়। হ্যাঁ, রাজনৈতিক দলগুলির এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য একটা সমস্যা বটে। কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই নির্বাচন কমিশনের সমস্যা নয়। সরকারের সমস্যা। তা হলে নির্বাচন কমিশন আগ বাড়িয়ে পরিকাঠামোর কথা তুলছে কেন? কেন্দ্রীয় সরকার যে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে তার প্রমাণ ল' কমিশনের সক্রিয়তা। এক দেশ এক নির্বাচন কার্যকর করার জন্য নতুন আইন প্রণয়নের কথা ভাবছে কমিশন।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, এক দেশ এক নির্বাচন বিধির বিরোধিতায় জাতীয় স্বার্থের হানি কীভাবে ঘটছে। এ প্রসঙ্গে নেতাদের পকেট ভারি করার কথা আগেই বলেছি। এবার একটু অন্য প্রসঙ্গ। এই নতুন নির্বাচনী বিধি প্রয়োগ করার মাধ্যমে সরকার নির্বাচনের খরচই সর্বাগ্রে কমাতে চায়। এক-একটি নির্বাচনে কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ হয়। মূলত নির্বাচনের ব্যবস্থাপনা, কর্মীদের বেতন এবং নিরাপত্তার জন্য খরচ হয় এই বিপুল পরিমাণ অর্থ। নির্বাচন এক সঙ্গে করা হলে খরচ একলপ্তে অনেকটাই কমবে। সেই টাকা জনকল্যাণমুখী কাজে ব্যয় করতে চায় সরকার। টাকা ছাড়াও সরকার আরও যা বাঁচাতে চাইছে সেটা হলো সময়। সারা বছর কোথাও না কোথাও নির্বাচন থাকায় রাজনৈতিক দল, মন্ত্রী এবং নেতারা নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রশাসনিক কাজকর্মে দেবার মতো সময় পান না। ব্যাহত হয় উন্নয়ন। প্রশাসনের স্বার্থে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়াও কার্যত অসম্ভব হয়ে ওঠে। এক সঙ্গে নির্বাচন হলে সময় বাঁচবে এবং সেই সময় ব্যয় করা যাবে দেশের উন্নয়নে। আর একটি বড়ো কারণ নির্বাচনী আচরণ বিধি। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়া মাত্র নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হয়ে যায়। এর ফলে সরকার নতুন কোনও প্রকল্প ঘোষণা করতে পারে না। সাধারণ মানুষ জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন।

সুতরাং এক দেশ এক নির্বাচন বিধির সঙ্গে যে জাতীয় স্বার্থ জড়িত সেটা বোঝার জন্য পণ্ডিত হবার দরকার পড়ে না। চোখ কান খোলা রেখে চিন্তা করলেই বোঝা যায়। কিন্তু আমাদের বিরোধী নেতারা এই সামান্য কাজটিও ঠিকমতো করতে পারেন না। সম্ভবত চানও না। গদি ছাড়া তারা কিছু ভাবতেই পারেন না। তাই বারবার উপেক্ষিত হয় জাতীয় স্বার্থ। প্রতারিত হয় মানুষ। এবং তাঁদের ঐক্যবদ্ধ জাতি হয়ে ওঠার স্বপ্ন। ▮

বর্তমান সময়ে একক নির্বাচন নানা কারণে প্রয়োজন

শুভদীপ সেন

একক বা সমসাময়িক নির্বাচনের বিষয়টি ভারতে নতুন নয়। ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ১৯৫০ থেকে ১৯৬৭ অবধি এই প্রথাটি চালু ছিল। ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯-এ কিছু রাজ্য সরকার এবং ১৯৭০-এ লোকসভার সময়ের পূর্বে অবলুপ্তির কারণে এই প্রথাটি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সমসাময়িক নির্বাচনের বিষয়টি পুনরায় আলোচনায় ফিরে আসে নির্বাচন কমিশনের ১৯৮৩ সালের বার্ষিক রিপোর্টে, তথা আইন কমিশনের ১৯৯৯-তে পেশ করা ১৭০ নম্বর রিপোর্টে এবং সংসদ স্থায়ী কমিটির ২০১৫তে পেশ করা ৭৯তম রিপোর্টে। 'নীতি আয়োগ'-ও ২০১৭ সালের তাদের এ বিষয়ের ওপর একটি বিশ্লেষণ পেশ করে।

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সমসাময়িক বা একক নির্বাচন একাধিক কারণে প্রয়োজন, যেমন :

গণতন্ত্রের শক্তিবর্ধন— বর্তমানে বিচ্ছিন্ন নির্বাচনী ব্যবস্থায় নির্বাচিত দলের কার্যকারিতা খর্ব হচ্ছে, কারণ নির্বাচিত সময়ের পাঁচ বছরের মধ্যে বিভিন্ন নির্বাচনের জন্য নির্বাচিত দলটি তার পুরো সময় এবং শক্তি দিয়ে উন্নয়নের কাজ করতে অক্ষম হচ্ছে।

ব্যয় এবং দুর্নীতি সংকোচনে— একক নির্বাচন কালো টাকা এবং দুর্নীতি দুই দানবকেই দমন করার ক্ষমতা রাখে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপরেও বারংবার নির্বাচনের প্রভাব নেতিবাচক। একক নির্বাচনে ব্যয় সংকোচন বহুভাবে সম্ভব, যা ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত ইতিবাচক।

ভারতীয় সংবিধানের ধারা ৮৩ (২) এবং ১৬২ (১)-তে যথাক্রমে লোকসভা এবং রাজ্যসভার মেয়াদ ৫ বছর স্থির করা আছে। ব্যতিক্রম একমাত্র সম্ভব যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালের সিদ্ধান্তে লোকসভা বা

রাজ্যসভার অবলুপ্তিকরণ (dissolution)। সময়ের পূর্বে সংসদের অবলুপ্তির ঘটনা এড়াতে এবং একক নির্বাচন বা একক ভোটগ্রহণ পুনরায় কার্যকর করার জন্য ভারতীয় সংবিধানের দশম সিডিউলের কার্যকারিতা এক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য করানো প্রয়োজন।

সংসদের স্থায়ী কমিটি এ ব্যাপারে কিছু সুপারিশ করেছে, যাতে প্রথম পর্যায়ে যে সব রাজ্যের নির্বাচন অদূরে, সেইসব রাজ্যের নির্বাচন ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই হোক এবং বাকি রাজ্যের নির্বাচন নির্ধারিত সময়সূচি মেনেই হোক। তারপর, অর্থাৎ ২০২৪ সাল থেকে একক নির্বাচন সার্বিকভাবে চালু করা যাবে।

উপরোক্ত উপায়গুলি বাস্তবায়িত করার পূর্বে অবশ্য কিছু সাংবিধানিক সংশোধন এবং ১৯৫১-র রিপ্রেজেন্টেশন অব পিপল্‌স্‌ অ্যাক্টের কিছু সংশোধন অবশ্যম্ভাবী। তার সঙ্গে এ-ও সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন যে সময়ের পূর্বে সংসদ অবলুপ্তিকরণ কোনও সাংবিধানিক বিধানের পরিপন্থী হয়ে যাবে কিনা অথবা একক নির্বাচন ব্যবস্থা কোনওভাবে ভারতীয় সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে লঙ্ঘন করবে কিনা।

সংসদের স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এক্ষেত্রে আইনগত ভাবে যা যা করা প্রয়োজন তা হলো :

(১) ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন, যথা সংবিধানের দশম সিডিউলের অনুচ্ছেদ ২ (১) (বি)-তে অ্যান্টি ডিফেকশন আইন অপ্রযোজ্য ঘোষিত করা বা রদ করা; ধারা ৮৩ এবং ১৭২-এর যথাযোগ্য সংশোধন যাতে নবনির্বাচিত লোকসভা বা পরিষদ পাঁচ বছরের বদলে অবশিষ্ট সময়ের জন্য কার্যকরী হয় এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে অধিকাংশ রাজ্য সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করে রাখাও প্রয়োজন যাতে পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থার বৈধতাতে কেউ আপত্তি না করতে পারে।

(২) রিপ্রেজেন্টেশন অব পিপল্‌স্‌ অ্যাক্ট, ১৯৫১-এর ধারা ২-তে একক নির্বাচনের সংজ্ঞা যোগ করা প্রয়োজন, ধারা ১৪ এবং ১৫-এর যথাযথ সংশোধন করা প্রয়োজন, যাতে সাধারণ নির্বাচনের ছয় মাসের মধ্যে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের বিধিবদ্ধ আইন আছে, সেই সময়সীমা বাড়ানো যায়।

(৩) লোকসভার নিয়মাবলীতে ১৯৮ সংখ্যক নিয়মটির পরে ১৯৮-এ যোগ করা প্রয়োজন, যাতে অনাস্থা প্রস্তাবের পরিবর্তে 'গঠনমূলক অনাস্থা ভোট' (constructive vote of no confidence)-এর সংস্থান আনা যায়।

(৪) লোকসভার স্পিকারের নির্বাচনের মতো, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান, যথা প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে তিনি লোকসভা বা রাজ্যসভায় নেতৃত্ব দিতে পারেন— এতে সরকারের তথা লোকসভা বা রাজ্যসভারও স্থায়িত্ব বর্ধন হবে।

আশা করা যায় উপরোক্ত সংশোধনী পদক্ষেপগুলি নিলে সমসাময়িক বা একক নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর কোনো আইনগত বাধা আসবে না।

(লেখক একজন আইনজীবী)

পশ্চিমবঙ্গকে ‘বাংলা’ বানানো মহাপাপ

ড. জিষ্ণু বসু

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বসম্মতভাবে ঠিক হয়েছে, এ রাজ্যের নাম হবে ‘বাংলা’। আজ থেকে একাত্তর বছর আগে ১৯৪৭ সালের ২২ জুন এই বিধানসভা ভাগ হয়ে তৈরি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা আর পূর্ববঙ্গ বিধানসভা। সেদিন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, সুচেতা কৃপালনীর মতো প্রবুদ্ধ মানুষেরা দল, মত, রাজনৈতিক বিভিন্নতা ভুলে একযোগে ‘পশ্চিমবঙ্গ’ তৈরির মহান কাজ করেছিলেন। সেদিন পশ্চিমবঙ্গ তৈরি না হলে আজ কলকাতা, বর্ধমান, মালদা, শিলিগুড়ি সবই ‘ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ’-এর অংশ হত!

গত ৭১ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ বাঙালি হিন্দুর হোমল্যান্ড, লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত, ধর্ষিতা, স্বজনহারা, সর্বস্বান্ত বাঙালি হিন্দুর আশ্রয়স্থান। পশ্চিমবঙ্গ মুক্ত চিন্তার ঠিকানা, বাংলাভাষী মানুষের একমাত্র স্বাধীনভাবে কথা বলার জায়গা। কমিউনিস্ট ইলা মিত্র, অশোক মিত্র বা লিগের দোসর যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলেরা পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে এসে প্রমাণ করেছিলেন যে, মত যার যাই হোক পূর্ব পাকিস্তানে মুখ খুলে কথা বলা যায় না। মত প্রকাশ করতে হলে, কথা বলতে হলে, শ্যামাপ্রসাদের তৈরি পশ্চিমবঙ্গেই আসতে হবে। বিগত ৭১ বছরে ‘জয়বাংলার’ আমেজটুকু বাদ দিলে এর বিশেষ ব্যতিক্রম প্রায় হয়নি বললেই চলে।

বিধানসভায় যাঁরা রাজ্যের নাম পরিবর্তন করেছেন, তাঁরা সকলেই সম্মাননীয় জনপ্রতিনিধি। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন সুপণ্ডিত সভাকবি, বিদূষকেরাও। তারা বলেছেন ‘পশ্চিমবঙ্গ আবার কী?’ ছিল তো ‘সুবে বাংলা’। তাদের পাণ্ডিত্যের খুরে খুরে নমস্কার। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে তো বাংলা, বিহার, ওড়িশা, আজকের ঝাড়খণ্ডও ছিল। সেটা কি বাংলা? অসমের রাজা উত্তরবঙ্গের কিছুটা নিয়ে নিয়েছিলেন। ইতিহাসের এমনই এক ক্ষুদ্র কালখণ্ডে এসেছে ‘সুবে বাংলা’, আবার উবেও গেছে। আসলে ভারতবর্ষের এই গণরাজ্যটিকে কেন বাংলা বলা যায় না, সেটা বোঝার হৃদয়টাই হয়তো এইসব রাজা-উজিরদের নেই। এটা বোঝার জন্য চাই ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা আর উদ্বাস্তু মানুষের বুকের কান্না শোনার মতো দরদি মন। হায় রে, পশ্চিমবঙ্গের বাবুসমাজ!

ভারতবর্ষের একটি রাজ্য বাংলা। এতো অতি বড়ো মিথ্যাচার! তবে মনসামঙ্গলের অন্যতম রচয়িতা বিজয়গুপ্ত বাংলার নন? শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমভক্ত নাগমহাশয় বাংলার নন? নাটোরের বনলতা সেন বাংলার নয়? আসলে যেটুকু ভুখণ্ডকে বাংলা বলে দাবি করা হচ্ছে বাংলা ভৌগোলিক ভাবে তার থেকে অনেক বড়। এটুকুকে বাংলা বললে বাকি অংশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভাবে, ধর্মীয় ভাবে আমাদের যোগসূত্রটা চিরতরে কাটা হয়ে যায়। ধর্মীয় ভাবে মুছে ফেলা যাবে, শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাবা জগন্নাথ মিশ্রের পৈতৃক ভিটে। ঐতিহাসিক ভাবে মুছে ফেলা যাবে উল্লাসকর দত্ত, বাঘাযতীন, চিত্তরঞ্জন দাশকে। কেউ প্রশ্ন করবে না যে ঢাকা শহরের উপর কয়েকশো বছরের পুরাতন রমনা কালী মন্দিরটা ভাঙা হলো কেন? যদি খানসেনারা ভেঙে থাকে, তবে এত বছরেও তা পুনরায় নির্মাণ করা হলো না কেন? ফরিদপুরের জগদ্বন্ধু আশ্রমের শ্রীরঙ্গম মন্দিরের চালতা গাছের নীচে হরিনাম সংকীর্তন করার অপরাধে সাতজন সন্ন্যাসীকে একসঙ্গে কেন হত্যা করা হয়েছিল? এ প্রশ্ন আমার পৌত্র করবে না। কারণ, আজকের পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধারেরা বাংলার সীমানা বেঁধে দিলেন।

তাই যে কোনো নিঃস্বার্থ বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ বুঝবেন যে, যাকে বাংলা বলে চালানো হচ্ছে সেটি ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক কোনো ভাবেই বাংলা নয়। কিন্তু কেন এই প্রয়াস? এর পেছনে লুকিয়ে আছে এক পাপের কাহিনি।

সত্যি বলতে কী ড. শ্যামাপ্রসাদের পরে বাংলার হিন্দু উদ্বাস্তুদের জন্য সত্যিই কেউ কিছু করেননি। দেশভাগের পর কংগ্রেস নেতারা যখন ক্ষমতার চিটেগুড়ে লুটোপুটি খাচ্ছিলেন, তখন পূর্ববাংলাদেশের একের পর গ্রামে হিন্দু মেয়ে ধর্ষিতা হচ্ছিল, লক্ষ লক্ষ হিন্দু শরণার্থী হয়ে এদেশে আসছিলেন। আর ভারতসরকার তাদের দণ্ডকারণ্যে বা ওড়িশার মালকানগিরিতে নরকবাসে পাঠাচ্ছিল। যেখানে পশুখামারে মানুষের থাকার ব্যবস্থা হতো! বামপন্থী সবকটি দল উদ্বাস্তু আন্দোলনের নামে ভোটব্যাঙ্ক বানিয়েছে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পরেই ভেড়ার চামড়ার ভেতর থেকে বের হয়েছে আসল নেকড়ের চেহারা। নৃশংসভাবে গুলি করে, জলে ডুবিয়ে, খাবার বন্ধ করে মরিচঝাঁপিতে মেরেছিল পূর্ববাংলা থেকে আসা নিরাপরাধ তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু উদ্বাস্তুদের। গত ৭১ বছরে লাগাতার চলেছে ধর্ষণ, হত্যা আর লুঠ। একতরফা শিকার পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা, যারা পৃথিবীর নরসংহারের ইতিহাসের এক ভয়াবহ দলিল। সত্তরের দশকে পূর্বপাকিস্তানের হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণ, গণহত্যার বিবরণ পাঠিয়েছিলেন এক মার্কিন আমলা, ব্লাড সাহেব। এই সেদিন ২০০২ সালে যখন বাংলাদেশে বিএনপি-জামাতের সরকার এল আবার ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতন ফিরে এল। গ্রাম থেকে শহরে সর্বত্র হিন্দু মেয়ে মানে গনিমতের মাল। ১৪ বছরের পূর্ণিমা শীলকে সারারাত ধরে ভোগ করল ১৪/১৫ জন নরপশু।

বাংলার হিন্দুদের এতবড়ো সর্বনাশের দিনেও এই বঙ্গে, এই কলকাতায় কোনো সর্বাত্মক প্রতিবাদ হয়নি। নিকারাগুয়ার জন্য, প্যালেস্তাইনের গাজার জন্য বামপন্থীরা কলকাতার রাস্তা স্তব্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু পূর্ববাংলার অমানুষিক নির্যাতনের জন্য একটি শব্দও কখনো বলেননি। আর সদ্য চৈতন্যপ্রাপ্ত ‘সুবে বাংলার’ ব্যাপারীদের কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণ, কালিয়াচকের থানা লুঠ থেকে সিমুলিয়ার মাদ্রাসা— বাস্তবিক অর্থেই ‘সুবে বাংলা’র আবহ ফিরিয়ে এনেছেন কর্তারা!

তাই এত পাপ, এত কাপুরুষতা এ ভীষণ মিথ্যাচারকে কার্পেটের তলায় লুকিয়ে ফেলার প্রয়াস হলো পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের এই চক্রান্ত। বিধানসভার ভেতরে বা বাইরে কেউ প্রতিবাদ করলেন না এতবড় অন্যায়ের।

বাংলাদেশে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা এখনো অবহেলিত

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশে সংস্কৃত ও পালি পড়ানো হয় ২২৭টি কলেজে। কিন্তু এই শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে গত চার দশকে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সংস্কৃত ও পালি শিক্ষকরা নামমাত্র বেতন নিয়ে কাজ করছেন। এ কারণে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে তাঁদের।

তবুও ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছেন তাঁরা। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, মাদ্রাসা শিক্ষার মতো এই শিক্ষার আধুনিকীকরণ জরুরি। কিন্তু সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক কারণে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা এখনো অবহেলিত রয়ে গেছে। সরকার সাম্প্রতিক সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে দিতে কওমি শিক্ষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। গত সপ্তাহে ঘোষণা করা হয়েছে কওমি মাদ্রাসার কামেল ডিগ্রি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ডিগ্রির সমমর্যাদা পাবে। অর্থাৎ দাখিল স্কুল সার্টিফিকেটের এবং ফাজিল স্নাতক ডিগ্রির মর্যাদা পাবে।

বিভিন্ন সময় সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড থেকে সরকারের কাছে এই শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হলেও তাতে আমল নেওয়া হয়নি। অথচ এই শিক্ষাকে মূলধারায় নিতে একমত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। ১৯৯৬ সালে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষার আধুনিকীকরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশও করেছিল ইউজিসি। কিন্তু তাতেও লাভ হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করে এ ব্যাপারে কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

সরেজমিন পরিদর্শন করে ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, গত চার দশকে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষকদের বেতন বেড়েছে সামান্য কিছু টাকা। ২২৭টি কলেজের ৬১৪ জন শিক্ষকের প্রত্যেককে সরকার থেকে মাসে বেতন দেওয়া হয় ১৭৯ টাকা ৪০ পয়সা। আর সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড চলে শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন ফি, ফরম পূরণ বাবদ নেওয়া অর্থ ও পরীক্ষা সংক্রান্ত আয় দিয়ে। এ কারণে শিক্ষকদের বেতন যেমন কম, তেমনই এই শিক্ষা বোর্ডেরও দুরবস্থা।

সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড ঘুরে দেখা যায়, রাজধানীর বাসাবো বৌদ্ধ মন্দিরের ভেতরে একটি ভবনের দুটি কক্ষ নিয়ে এর অফিস পরিচালিত হচ্ছে। শুধু রক্ষণাবেক্ষণের খরচ দিয়ে বিনা ভাড়ায় চলছে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানটি। পদাধিকারবলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডেরও চেয়ারম্যান। শিক্ষা বোর্ডের অবৈতনিক সচিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সাবেক অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী। এছাড়া একজন উপ-সচিব, একজন হিসাবরক্ষক-সহ এই বোর্ডের মোট জনবল ১০।

সারাদেশের মোট ২২৭টি কলেজে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক রয়েছেন ৬১৪ জন। এছাড়া ২২৭ জন কর্মচারী-সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন মোট ৮৪১ জন। প্রতি বছর পরীক্ষায় অংশ নেন ২০ হাজারের মতো শিক্ষার্থী। এস এস সি পাশের পর তিন বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হন তাঁরা। কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ, আয়ুর্বেদতীর্থ, পুরাণ, জ্যোতিশাস্ত্র, স্মৃতি, বেদ ও বেদান্ত বিষয়ে পড়ানো হয় তাঁদের।

জানা গেছে, ১৯৭৭ সালের আগে দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো জাতীয় বেতন কাঠামোর আওতায় শিক্ষকরা মাসে বেতন পেতেন ১৪৯ টাকা ৫০ পয়সা। আর কর্মচারীরা বেতন পেতেন মাসে ৬০ টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকা-র গত কয়েকটি সংখ্যায় স্বস্তিকার প্রতি কপির ও বার্ষিক গ্রাহক মূল্য বৃদ্ধির যে ঘোষণা করা হয়েছিল তা আপাতত স্থগিত রাখা হলো। পুনরায় বিজ্ঞপ্তি মারফত না জানানো পর্যন্ত স্বস্তিকার দাম ও গ্রাহকমূল্য একই থাকবে।

— সম্পাদক, স্বস্তিকা

বলেছেন, ১৯৭৭ সালে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক কারণে এই বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

একই কথা উল্লেখ করলেন সংস্কৃত ও শিক্ষা বোর্ডের উপ-সচিব অসীম চৌধুরী। তিনি বলেন, ১৯৭৭ সালের জাতীয় বেতন কাঠামোতেই রাখা হয়নি সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা কলেজগুলোকে। এরপর চলতে থাকে অবহেলা। সর্বশেষ ২০১৫ সালে জাতীয় বেতন কাঠামো নির্ধারণের আগে এসব শিক্ষকের বেতন বাড়িয়ে ১৭৯ টাকা ৪০ পয়সা ও কর্মচারীদের বেতন ৭৮ টাকা করা হয়। প্রাচীন শিক্ষার ঐতিহ্য ধরে রাখা ও সামান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজন মেটানোর প্রতিষ্ঠান হিসেবেই ৪০ বছরের অবহেলা সঙ্গী করে এসব কলেজ টিকে আছে। আদর্শগত কারণ ও ঐতিহ্য ধরে রাখার তাগিদে শিক্ষকরা প্রতিষ্ঠানগুলো চালাচ্ছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ১৯৭৩ সালে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষকদের জাতীয় বেতন কাঠামোর আওতায় আনেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাকে ১৯৭৫ সালে সপরিবারে হত্যা পরবর্তী সময়ে ক্ষমতায় আসা সরকার সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক আদর্শের কারণে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা কলেজকে বেতন কাঠামোর বাইরে ঠেলে দেয়। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্য ধরে রাখতে প্রতিষ্ঠানগুলো বাঁচিয়ে রেখেছেন নিবেদিত একদল মানুষ।

সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডের সচিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী বলেন, প্রাচীন ঐতিহ্য ধরে রাখতেই কোনোরকমে এই শিক্ষা ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা বিভিন্ন সময় সরকারের কাছে শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এই শিক্ষাকে মূলধারায় নিতে আমাদের প্রস্তাবের পক্ষে মত রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনেরও (ইউজিসি)। ১৯৯৬ সালে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষাকে আধুনিক করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করেছিল ইউজিসি। কিন্তু সেটি এখনও সেভাবেই পড়ে আছে।

সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডের দাবিকে যৌক্তিক মনে করছেন বিশিষ্ট কথাশিল্পী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। তার মন্তব্য, সরকারের উচিত দ্রুত এটির বাস্তবায়ন করা। খুব কমসংখ্যক কলেজ ও শিক্ষক তাদের, ফলে সরকারের কাছে এটি করা সহজ। ঐতিহ্যবাহী এ শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনও অনেক শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে, এটি একটি বড় সাফল্য। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার নতো এই শিক্ষার আধুনিকীকরণ জরুরি। অধ্যাপক ইসলাম বলেন, সংস্কৃত কলেজগুলোর শিক্ষা অন্য কোনও শিক্ষার চেয়ে ছোট বা বড়, সেই বিচারে যাওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, কোনও কারণেই বলার সুযোগ নেই এটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষা বা এটা তারাই দেখভাল করছেন। যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তাতে জনগোষ্ঠীর সংখ্যা নিরূপণ করা মোটেই কাম্য নয়। সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা তিন বছরের কোর্সটিকে এইচএসসি সমমানের করার পরামর্শ দিয়েছেন ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। এছাড়া এই কোর্সকে পাঁচ বছর বাড়িয়ে ডিগ্রি সনদের সমান করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তিনি। পাশাপাশি পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রম আধুনিক করারও পরামর্শ দেন তিনি।

সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ডের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) ড. আব্দুল মান্নান বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে মন্ত্রণালয়ে। শিক্ষকদের জাতীয় বেতন স্কেলে অথবা নির্ধারিত বেতনের আওতায় আনার প্রস্তাবনা রয়েছে। পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রম পরিমার্জনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক করতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের গঠন করা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী আমরা প্রস্তাব করেছি।

জানা যায়, ১৯৯৬ সালে ইউজিসির সুপারিশগুলোর মধ্যে ছিল সংস্কৃত ও পালিকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, মাদ্রাসা শিক্ষার মতো সংস্কার; ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে সংস্কৃত ও পালি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা, নবম ও দশম শ্রেণীতে সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য বিষয়ে ১০০ নম্বরের একটি পত্র যোগ করা, ডিগ্রি স্তরে সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের পাশাপাশি ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম রাখা। এছাড়া ডিপ্লোমা কোর্সটির সংস্কার, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার সনদের সঙ্গে সংস্কৃত ও পালি শিক্ষার সমতা এবং এই শিক্ষা বোর্ডকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বায়ত্তশাসিত বোর্ডে রূপান্তরের সুপারিশ করে ইউজিসি। ■

মুখ্যমন্ত্রীর বাস্তবোচিত হওয়া প্রয়োজন

অসমে নাগরিক পঞ্জীকরণ নিয়ে উত্তাল আমাদের পশ্চিমবঙ্গ। বিরোধিতার প্রথম সারিতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। বস্তুত ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে বেলাগাম অনুপ্রবেশের কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। বর্তমানে অনুপ্রবেশের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে বাংলাদেশ ও মায়ানমারের অরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর 'বাঙালি সংকট'-এর অসমের নাগরিক পঞ্জীকরণ ইস্যুতে কতটা যৌক্তিকতা আছে তার চুলচেরা বিশ্লেষণের কি দরকার নেই? বাঙালি এই শব্দের ভিতর বঙ্গভাষী হিন্দু ও মুসলমান আছে। সাবেক পূর্বপাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশ থেকে উভয়ের আসার কোনো বিরাম নেই স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে। হিন্দুরা চলে আসার ব্যাপারে আমাদের দায়বদ্ধতা এবং মানবিকতা বর্তায়, কিন্তু মুসলমানরা কেন চলে আসছে এর সঠিক ব্যাখ্যা কোনোদিন করা হবে না, বরং জামাই আদরে তাদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ধরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ভারতবর্ষের জন অরণ্যে তারা মিশে যায়। রাজনৈতিক নেতারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে এর চেয়ে বড়ো নজির হয়তো খুঁজে পাবে না কিন্তু ভবিষ্যতে দেশটা কোন দিকে পরিচালিত হবে সে বিষয়ে কোনও হুঁশ নেই। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে অধিকাংশ সময়ই পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস, কমিউনিস্টরা শাসন করেছে, বর্তমানে তৃণমূল শাসনাধীন। এই তিন দল কত বড়ো 'ধর্মনিরপেক্ষ' তার প্রতিযোগিতায় শামিল হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের মাফিয়া, গোরু পাচারকারী, ব্যবসায়ী, গুন্ডা, জঙ্গিরা পশ্চিমবঙ্গের পূর্বাঞ্চলে একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করে ফেলেছে। তারা ভোট যুদ্ধে নির্ণায়ক শক্তি হবে একদিন। কাদের লাভ হবে? প্রাকস্বাধীনতা পর্বে ধর্মীয় সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে বিভাজন প্রক্রিয়ার বলি হিন্দুরা, আর যে মর্মন্তুদ কাহিনি ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে তা এখনও বিস্মৃত হয়ে যাইনি। অতএব আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতা কতটা গণতান্ত্রিক আর কতটা বাস্তবোচিত এ প্রশ্ন কি থেকে যাচ্ছে না?

—**বিরূপেশ দাস,**
বর্ধমান।

প্রসঙ্গ : প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী স্মরণে

কেরলে বন্যা নিয়ে সম্পাদকীয় ভালো লাগলো। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে আপনারা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। বিজয় আঢ্যর রচনা থেকে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানলাম। তাঁর মৃত্যু রাজনৈতিক জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। তিনি বিচক্ষণ রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, ছিলেন কবিও।

—**অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়,**
১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

নেত্রদান

উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা থানার বেড়াচাঁপা এলাকার বাসিন্দা সমাজসেবী দীপক কাহার এক অনন্য নজির সৃষ্টি করলেন। তিনি অকালে প্রয়াত তাঁর মায়ের দুটি চক্ষুই দান করলেন হাসপাতালে, যে চোখ দিয়ে পৃথিবীর আলো দেখবেন আরও দুজন মানুষ।

গত ৭ আগস্ট বেড়াচাঁপার দেবালয়ের বাসিন্দা দীপক কাহারের মা মারা যান। হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে আরজিকর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই মাত্র ৪৩ বছর বয়সে তিনি মারা যান। সেই শোকের মধ্যেও দীপকবাবু দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন, তাঁর মায়ের চোখ দু'টি দান করবেন। সেই মতো হাসপাতালে জানানো হয়। কিন্তু আরজিকর হাসপাতাল থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় তাদের পক্ষে কর্নিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এর পর দীপকবাবু যোগাযোগ করেন ব্যারাকপুরের দিশা হাসপাতালের সঙ্গে। ওই বেসরকারি চক্ষু হাসপাতালই

দীপকবাবুর ইচ্ছাপূরণ করে। তারা দীপকবাবুর মায়ের কর্নিয়া দু'টি সংগ্রহ করে।

দীপকবাবু অনেক বছর ধরে সমাজসেবা কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি আর এস এসের দেবালয় খণ্ডের খণ্ড সেবা প্রমুখ হিসেবে সেবা কাজ করে চলেছেন। তাঁর এই সেবাপরায়ণতার দৃষ্টান্ত আরও অনেককে নেত্রদানে উদ্বুদ্ধ করবে বলে মনে করেন তাঁর আত্মীয়স্বজন।

—**সনৎকুমার মল্লিক,**
কলকাতা-৬।

অতি লোভের ফল

নাগরিকপঞ্জি নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা কেঁদেকেটে একসার। কত যেন বাঙালি দরদি! নাম ছুটদের নাম উঠানোর জন্য চিন্তায় রাতের ঘুম ছুটে গেছে। এক্ষেত্রে একটা উদাহরণ অবশ্যই মনে পড়ে। মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ নিজের ছেলের মাথা কেটে সোনার থালায় করে ঔরঙ্গজেবের চরণে উপহার দিয়েছিলেন নিজের রাজ্য রক্ষার জন্য। ইসলামে ধর্মান্তরিত হতেও বাদ রাখেননি। কারণ রাজ্যের লোভই সবচাইতে বড়ো, ধর্ম নয়। বর্তমান নেতাদের দরদটা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের জন্য। তাহলে এদেশে বসবাসকারী মুসলমানরা সন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের দেশে যেসব মুসললমান বাস করে যাদের মাতৃভূমির প্রতি সহানুভূতি আছে তারা কখনই এসব অনুপ্রবেশকারীকে বরদাস্ত করবে না। তারা জানে এতে তাদের চাকরি বাকরি খাদ্য বাসস্থানে টান পড়বে। কারণ কেউ চায় না নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করতে। আমাদের দেশের মুসলমানদের সবার ব্যবহারই খারাপ একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। ভালো মানুষও যথেষ্ট চোখে পড়ে। যদি সেটা না হতো তাহলে মুর্শিদাবাদে হিন্দু মন্দির সংস্কারের জন্য মুসলমান

ভাইয়েরা ১৫ লক্ষ টাকা তুলে দিত না। হিন্দুর মৃতদেহ মাথায় করে শ্মশানে নিয়ে যেত না। একে বলে প্রকৃত মানসিকতা। কিন্তু কিছু নেতা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাম্প্রদায়িক বিভাজনের চেষ্টা করছে। আমার মনে হয় আমাদের দেশের সচেতন মুসলমান ভাইয়েরা এটা কিছুতেই মনেপ্রাণে মেনে নেবে না। দেশভক্ত মুসলমান অবশ্যই আছে আমাদের দেশের কিছু নেতা এটা জানে না একথা বলবো না, এরা জেনেও না জানার ভান করে। তথাকথিত বাঙালি প্রীতি দেশের যে কত বড় সর্বনাশ ডেকে আনবে সেটা সেই গভীর রাতের ভূতের গল্প শুনে গা ছমছম করার মতো অবস্থা। এদের মেকি কান্না দেখে একটি উদাহরণ অবশ্যই দিতে হয়। বিষ্ণু শর্মার পঞ্চতন্ত্রের একটি গল্প। অতি লোভের ফল। এতে একটি বুড়ো বক খাবার না পেয়ে একটি অদ্ভুত ফন্দি আটলো। সে জলাশয়ের ধারে গিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদতে লাগলো সেটা দেখে একটা কাঁকড়া তাজ্জব বনে গেল। সে ভয়ে ভয়ে বললো কী ব্যাপার মামা কাঁদছো কেন? খাবার পাওনি বুঝি? বক কান্না থামিয়ে বলল, নারে ভাগ্নে, খাবারের জন্য নয় আমার তিন কাল গেছে এক কালে আছে আমি আর জীব হত্যা করি না। সব সময় ভগবান সাধনায় ব্যস্ত থাকি। আমি তোদের জন্য কাঁদছি। ১২ বছর বৃষ্টি হবে না। এই জলাশয়ের জল শুকিয়ে যাবে। তোরা যে জল বিনা মরবি, তাই আমার এই কান্না। তাই ভাবছি তোরা যদি রাজি থাকিস আমি তোদের পিঠে করে গভীর জলে ছেড়ে দিয়ে আসব, তোরা আনন্দে থাকবি। এতে খুশি হয়ে জলাশয়ের মাছ ব্যাঙ কাঁকড়া কচ্ছপ সবাই রাজি হলো। এদের পিঠে করে পাহাড়ের ধারে নিয়ে নিয়ে পাথরে আছাড় মেরে খেতে লাগলো। একদিন কাঁকড়ার সঙ্গে দেখা, বলল, মামা সবাইকে নিয়ে যাচ্ছ আমাকে নিলে না? অগত্যা বক সৌজন্যতার খাতিরে কাঁকড়াকে পিঠে করে নিয়ে পাহাড়ের ধারের দিকে রওনা হলো। কাঁকড়ার ধারণা হলো জলাশয় কোথায়, বককে জিজ্ঞেস করতেই বক বলল জলাশয় আমার পেটের মধ্যে। কাঁকড়া এর চালাকি বুঝতে পেরে তার ধারালো দাঁড়া দিয়ে বকের গলা কেটে দিল। হ্যাঁ আমাদের দেশের কিছু নির্বোধ নেতার এমনই দশা কপালে আছে।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
নদীয়া।

মমতা ব্যানার্জির হঠকারিতা রাজ্যের মানুষ মেনে নেবে না

ইদানীং অসমের এন আর সি নিয়ে আমাদের রাজ্যে একেবারে হুলুস্থুলু পড়ে গেছে। এখানকার নেতা, বুদ্ধিজীবী, খবর-ব্যবসায়ী নাওয়া-খাওয়া ভুলে যে যার ক্ষমতা মতো নিজের নিজের আখের গোছাবার ধান্দায় এর বিরোধিতায় নেমে পড়েছে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাঙালি আবেগকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি বলছেন এন আর সি-র মাধ্যমে অসম সরকার বাঙালিদের তাড়াবার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের এ রাজ্যের বাঙালির সঙ্গে ঘুলিয়ে দিয়ে সেই ঘোলা পরিবেশে নিজের ভোট বৈতরণী পার করার নিপুণ কৌশলী খেলায় মেতেছেন তিনি। সম্প্রতি একটি বিখ্যাত কাগজের খবরে দেখলাম বাঙালি সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দেওয়ার অভিপ্রায়ে মাননীয়া বলছেন বাংলাদেশ থেকে যে জামদানি শাড়ি, ইলিশমাছ, সন্দেশ, মিষ্টিদই ইত্যাদি এ দেশে আসে তাদের কি অনুপ্রবেশকারী বলবো? অমনি এক দল মোসাহেব আঁতেল দেখছি ওয়াটসআপ, ফেসবুকে লিখতে আরম্ভ করেছে— ''ইলিশমাছ, জামদানি শাড়িকে কি অনুপ্রবেশকারী বলবেন?'' কীসের সঙ্গে কীসের তুলনা! যেমন শাসক তেমনি তাঁর মোসাহেবের দল। মূর্খদের কী করে বোঝাবেন যে তুলনা কেবল সমধরনের, সমমাত্রার, সমগুণের বস্তুর মধ্যেই হতে পারে। বিদেশি অনুপ্রবেশকারী আমাদের দেশে ঢুকে স্থায়ী ভাবে বসবাস করলে, এদেশের যাবতীয় সম্পদে ভাগ বসালে আমাদের দেশের নাগরিকদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে; তাছাড়া আমাদের দেশের সুরক্ষার পক্ষেও তা ভীষণ ক্ষতিকর। কিন্তু ইলিশমাছ, জামদানি শাড়ি বা দই মিষ্টি থেকে সে ভয় আছে কি? তবে এসব বস্তুও অন্য রাষ্ট্র থেকে নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক নিয়মকানুনের মাধ্যমেই আমাদের দেশে প্রবেশ করে। বেআইনি চোরাই পথে নয়, সেক্ষেত্রে তাও হবে বেআইনি অনুপ্রবেশ--- ইলিশমাছ বা জামদানি শাড়ি হলেও। সেটাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মাননীয়া ও তার মোসাহেবরা নিশ্চয়ই তা মানবেন।

আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো আমাদের রাজ্যের মাননীয়া যখন এ রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন না, যখন এখানে বামফ্রন্টের শাসন চলছিল। সেই ২০০৫ সালে সংসদ ভবনে ভয়ানক চিৎকার চেঁচামেচি করেছিলেন বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে যে তারা বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিচ্ছে ভোটব্যাঙ্কের লোভে। তিনি প্রমাণের জন্য গোছা গোছা কাগজ নিয়ে গেছিলেন অনুপ্রবেশকারীদের তালিকা বানিয়ে এবং সেইসব কাগজের গোছা ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে স্পিকারের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন--- এ ছবি আমরা টিভি-তে দেখেছি। ক্ষমতায় এসে তিনি উল্টো সুরে কথা বলছেন। বামফ্রন্টের মতো মুসলমানদের তিনিও ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করছেন। তাই মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের মদত দেওয়া তাঁর দরকার হয়ে পড়েছে এবং কূটকৌশল অবলম্বন করে, মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের ভাষা আর আমাদের ভাষা একই হওয়ার কারণে অসম সরকার 'বাঙালি তাড়াচ্ছে' 'বাঙালি তাড়াচ্ছে' বলে তারস্বরে চেঁচামেচি আরম্ভ করেছেন।

কোনও সুস্থচিন্তার রাষ্ট্রনেতাই তাঁর নিজের দেশের নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুরক্ষাকে বিপদের মুখে ফেলতে পারেন না। অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি মানবতা দেখাবার নাম করে নিজের দেশের নাগরিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সুরক্ষাকে তিনি অবহেলা করতে পারেন না। দেশের নাগরিকরা কখনই তা মেনে নেবেন না।

—প্রণব দত্ত মজুমদার,
কলকাতা-৪৮।

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে সন্তানকে সচেতন করার দায়িত্ব মায়েদের

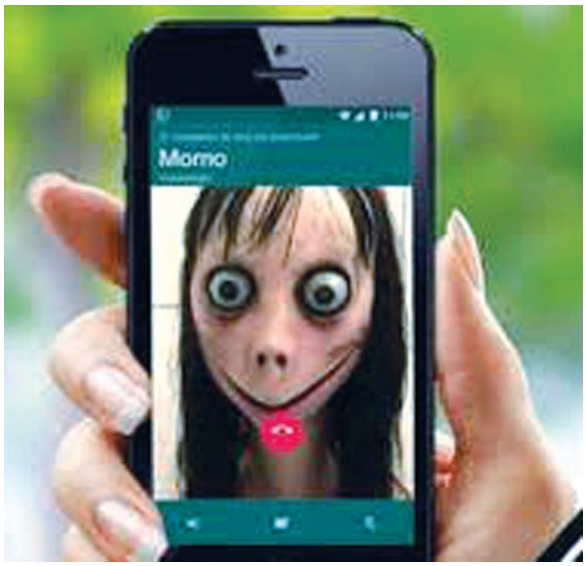

সুতপা বসাক ভড়

বিজ্ঞান আশীর্বাদ, না অভিশাপ? এই নিয়ে অনেক আলোচনা-বিতর্কসভা আয়োজিত হয়েছে। বিজ্ঞানের অপব্যবহার সম্বন্ধে আমরা আগের থেকে যথেষ্ট সচেতন হবার চেষ্টা করে চলেছি; অথচ আশ্চর্যের কথা হলো বিজ্ঞানের অপব্যবহার করছে বিজ্ঞানেরই কিছু তুখোড় পণ্ডিত। একদিকে কিছু মানুষ আছেন যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণের কাজে লাগাচ্ছেন, অপরদিকে কতিপয় কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানের কুপ্রয়োগ করে আপামর জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানকে ভীতিপ্রদ করে তুলছে। তাদের এই ধরনের কার্যকলাপের জন্যই বিজ্ঞান সময় বিশেষে আমাদের জীবনে অভিশাপ হয়ে উঠেছে।

মোবাইল ফোনের ব্যাপক ব্যবহার আমাদের জীবনে স্বস্তির থেকে অস্বস্তি ডেকে এনেছে। এটি ব্যবহারের ফলে আমরা আমাদের নিকটজনের সঙ্গে খুব সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি। যখন-তখন গান শুনতে পারি। স্মার্টফোনের ফলে ইন্টারনেট খুবই সহজলভ্য এবং পৃথিবীর সমস্ত খবরাখবর আমাদের হাতের মুঠোয়। উল্টো দিকে, প্রায় প্রত্যেকের হাতেই আজ মোবাইল ফোন। যোগাযোগ রাখা এখন খুবই সহজ মাধ্যম, অথচ দুশ্চিন্তা-টেনশান কমেছে কি? কারণে-অকারণে ফোন করা আমাদের স্বভাবে এসে গেছে। এবার সেই ফোনে যদি কেউ সাড়া না দেয়, তখনই দুশ্চিন্তার সূত্রপাত! অথচ বাড়ির বাইরে সব পরিস্থিতিতে ফোনে সাড়া দেওয়া সবসময় সম্ভব হয় না। এদিক দিয়ে অহেতুক চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মোবাইল ফোন। আবার বহু লোক বিশেষত যুবসমাজ মোবাইলের চক্করে পড়ে হঠাৎ করে সংগীত প্রেমী হয়ে উঠেছে। কানে ঠুলি লাগিয়ে পড়াশুনা, রাস্তায় চলা, বাসে-ট্রেনে ওঠা, সাইকেল-বাইক-গাড়ি সব চালিয়ে যাচ্ছে। পরিণামে প্রায় প্রতিদিনই খবরের কাগজে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কানে ইয়ারফোন থাকার জন্য হর্ন না শুনতে পেয়ে কেউ না কেউ অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। এরপর রইল সেল্‌ফি। কত প্রাণ যে সেল্‌ফি নিতে গিয়ে গেল তার ইয়ত্তা নেই। আশ্চর্যের কথা। এতেও লোকের শিক্ষা হচ্ছে না। এরপর ইন্টারনেটে কত যে উল্টোপাল্টা জিনিস সহজলভ্য, তার ধারণা আমাদের সকলেরই একটু-আধটু আছে। যুব-সমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্য ওই সাইটগুলি যথেষ্ট। এছাড়া আছে হোয়াট্‌সঅ্যাপ। বহুমানুষ ঘনিষ্ঠদের মধ্যে অনেক ভালো কিছু শেয়ার করেন, তবে কিছু কুরুচিপূর্ণ মানুষের পাঠানো ভিডিও বা জোক্‌স বিরক্তির উদ্রেক করে থাকে। এবার আপনি সেটি হয়তো না জেনে দেখলেন, ওদিকে ওই মানুষটি ঠিক জানতে পেরে গেল, আপনি ওর পাঠানো খবরটি দেখেছেন। ততোধিক উৎসাহিত হয়ে সে আরও কুরুচিপূর্ণ কিছু আপনাকে শেয়ার করতে থাকবে। তাই হোয়াট্‌সঅ্যাপের কনট্যাক্ট লিস্টে অপরিচিতদের নাম না রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই ওয়াট্‌সঅ্যাপের মাধ্যমে বিপদ বাড়িতে বসেই হানা দিতে পারে আপনার সন্তানের মোবাইল ফোনে। সেজন্য মায়েদের সাবধান থাকতে হবে। ছেলেমেয়েদের মোবাইল গতিবিধি এবং তাদের মানসিক অবস্থার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। গত বছর ব্লুহোয়েল খেলাটির জন্য বহু ছেলে-মেয়ের প্রাণ অকালেই নষ্ট হয়ে গেছে। এখন ওই ধরনেরই আর একটি হোয়াট্‌সঅ্যাপ খেলা 'মোমো' অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত এই খেলাটিতে কিশোর এবং কিশোরীদের নিশানা বানানোর চেষ্টা করা হয়। নানারকম হিংস্র ছবি ইউজারকে পাঠানো হতে থাকে। যদি কেউ এই খেলাটি খেলতে বারণ করে, তবে তাকে ভয় দেখানোর চেষ্টাও করা হয়ে থাকে। খেলাটি ধীরে ধীরে সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়ে চলেছে।

অঙ্গনা

বর্তমানে হোয়াট্‌সঅ্যাপে একটি নম্বর ভাইরাল হয়ে চলেছে, এটি মোমো হোয়াট্‌সঅ্যাপ চ্যালেঞ্জ নামেও পরিচিত। এই খেলাটিতে সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি কনট্যাক্ট নম্বর শেয়ার করা হচ্ছে, যার কান্ট্রিকোড জাপানের। ইউজার যখনই মোবাইলে ওই কনট্যাক্ট নম্বরটি সেভ করে নেয়, তখন একটি ভয়ঙ্কর বড় বড় চোখের মেয়ের ছবি এসে যায়। এই ছবিটি বানিয়েছেন জাপানি শিল্পী মিদোরি হায়াগি। এই খেলার সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। সন্দেহ করা হচ্ছে যে, এই প্রোফাইল নম্বরে যোগাযোগ করে কিশোর-কিশোরী এবং যুবক- সমাজকে এই খেলাটির মাধ্যমে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়ে চলেছে। এছাড়া, এই ধরনের খেলায় আসক্ত হলে, তারা ডিপ্রেশনের শিকার হয়ে পড়বে। সাবধানতার জন্য সন্তানদের নিজের কনট্যাক্ট লিস্টে কেবলমাত্র পরিচিতদের নম্বরই সেভ করতে বলুন। আপনার সন্তান সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে কী শেয়ার করছে, সেদিকেও লক্ষ্য রাখুন; বিশেষ করে ফোন নম্বরগুলি। কারণ সোশ্যাল মিডিয়াতে যে কেউ সহজেই আপনার বা আপনার সন্তানের ফোন নম্বর নিতে পারে। সুতরাং, মায়েরা সতর্ক দৃষ্টি রাখুন সন্তানের মোবাইল ফোন ব্যবহারের দিকে। অবশ্যই তাদের আগে থেকেই জানিয়ে রাখুন এই বিপজ্জনক খেলাটি সম্বন্ধে। তাহলে হয়তো আপনার সন্তান খুব সহজেই একটি ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবে! ■

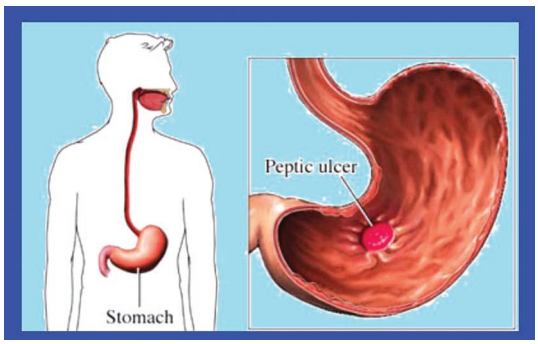

পেটের আলসার ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

অনেকেরই গ্যাসট্রাইটিসের সমস্যা হলে একটু অ্যান্টাসিড বা ব্যথা বাড়লে ডাইসাইক্লোমিন বা অ্যান্টিস্প্যাসমোডিক জাতীয় কোনও ওষুধ খেয়ে সমস্যার আপাতত সমাধান করতে হয়। কিন্তু এই করতে করতে কখন যে আলসার তৈরি হয়ে যায়, আমরা তা বুঝতেই পারি না। পেটের আলসার হলো পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের স্তরে সৃষ্ট এক ধরনের ক্ষত যার জন্য ভেতরে রক্তপাত বা মাত্রাতিরিক্ত সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। তাই সময় থাকতেই সচেতন হতে হবে। নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

১। **ঘন ঘন পেটের উপরদিকটায় ব্যথা :** ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর গ্যাস্ট্রোএন্টোরোলজি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ নীল সেনগুপ্তের মতে, আলসারের সবচেয়ে সাধারণ উপসর্গ হলো পেটের উপরদিকটায় মাঝবরাবর ক্র্যাম্পের মতো ব্যথা। খাদ্যনালীর যে কোনও জায়গায় আলসার হতে পারে। তবে অনেকেই ভেবে নেন যে পাকস্থলী বা ক্ষুদ্রান্ত্রে হয়েছে। যেখানে ব্যথা সেখানে ক্ষত হবে এমনটা সব সময় না-ও মিলতে পারে। আলসারের জন্য হালকা থেকে তীব্র পেট ব্যথা হতে পারে, সঙ্গে তীব্র জ্বালাপোড়ার অনুভূতি। মনে হয় সেখান থেকে কিছু বেরিয়ে গেলে আরাম হবে। প্রায়ই এরকম ব্যথা হলে মারাত্মক কিছু হওয়ার আগে পরীক্ষা করুন।

২। **গা বমি ভাব বা বমি হয়ে যাওয়া :** পেটে আলসারের প্রাথমিক পর্যায়ে যে সকল উপসর্গ থাকে, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান বমি। কেননা এর ফলে পাকস্থলী বা অন্ত্র থেকে যেসব উৎসেচক নিঃসরণ হয়, তাতে নানা রদবদল ঘটে। আলসারের একটি মারাত্মক উপসর্গ হল খাবার খাওয়ার পর পেট ব্যথা বা তৈলাক্ত, চর্বিযুক্ত, জাংফুড খেলে গা বমি হতে থাকে আর যাও-বা খাওয়া হলো মনে হতে থাকে কতক্ষণে তা বমি করে ফেলব। বমি হলেও সঙ্গে পেট ব্যথা থাকলে আইবুপ্রোফেন বা অ্যাসপিরিনের মতো পেইনকিলার তখন খাবেন না, কেননা এটি সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দেবে। ডাঃ সেনগুপ্তের মতে, এসব ধরনের উপসর্গের ক্ষেত্রে ওভার দ্য কাউন্টার বমির ওষুধ (দোকান থেকে প্রেসক্রিপশন ছাড়া) কিনে খেলে সমস্যা বাড়াবে বই কমবে না।

৩। **পায়খানার সঙ্গে রক্তপাত :** অনেকেরই কালো মল হয়, তার অর্থ দুটো— হয় কোষ্ঠকাঠিন্য, কিংবা মলের সঙ্গে রক্ত যাওয়া। যদি জি আই ট্র্যাক্ট (মানে খাদ্যনালী) থেকে রক্তপাত হয়, সেই সঙ্গে বমি, পাকস্থলী বা বুকে ব্যথা হয়, তাহলে আলসার সুনিশ্চিত করতে চিকিৎসকরা আপার ট্র্যাক্টের মানে খাদ্যনালীর উপরি অংশের এন্ডোস্কোপি করার পরামর্শ দেন। হতে পারে যাকে আপনি আলসার ভাবছেন তা হেমোরয়েড বা কোলন ক্যান্সারের প্রাথমিক লক্ষণ। তাই রক্ত যাওয়ার আসল কারণটা খুঁজে বের করতে ডাক্তার দেখাতেই হবে।

৪। **খাওয়ার পরেই বুক জ্বালা :** হার্টবার্ন শব্দটা এখন চারপাশে বেশি ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ বুকজ্বালা। বুকের মধ্যে মনে হয় খাবার খাওয়ার পরেই একটা চাপা জ্বালাধরানো অনুভূতি। যা কিছুই খান না কেন, যদি আপনার বারবার বুক জ্বালা হয়, এর জন্য দায়ী হতে পারে গ্যাস্ট্রিক আলসার। বেশিরভাগ আলসার রোগীই একটু গুরুপাক খাওয়ার পর তীব্র বুকব্যথা অনুভব করেন, সঙ্গে হার্টবার্ন, ইনো বা পেপফিজ জাতীয় ঢেকুর তোলার ওষুধ খেয়ে সাময়িক স্বস্তি মিললেও এটা পাকাপাকি উপশম নয়।

৫। **পেট যখন স্বাভাবিকের থেকে বেশি ফাঁপে :** মাঝে মধ্যে পেট ফাঁপা সবারই হয়। কিন্তু প্রায়ই হচ্ছে, পেট ফুলে থাকছে, তাহলে তা আলসার বা ফ্যাটি লিভারের মতো অসুখের দিকে ইঙ্গিত করতে পারে। প্রায়শই পেট ফেঁপে থাকছে, অল্প খেলেই মনে হচ্ছে অনেকটা খেয়ে ফেলেছি, এগুলি আলসারের প্রাথমিক উপসর্গ। অনেকে এর থেকে কোমরে ব্যথাও অনুভব করেন। অবশ্য পর্যাপ্ত জল না খেলেও পেট ফাঁপা হয়।

৬। **মুখে রুচি নেই, সঙ্গে বদহজম :** গ্যাসট্রিক আলসার নীরবে যদি আপনার শরীরে বাড়তে থাকে, তাহলে একটা সময়ের পর খাওয়ার রুচি আর ইচ্ছে দুটোই কমে যায়। সঙ্গে ওজন কমে যাওয়ার সমস্যা থাকলে ধরতে হবে অন্ত্রের কোনও সমস্যা হয়েছে। অনেকে বলেন নির্দিষ্ট খাবার খাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমছে। আলসার নিজেই ওজন কমাতে পারে।

৭। **খাওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই মনে হয় পেট খালি :** এটা তো খুবই সাধারণ একটা উপসর্গ। নাভি বা বুকের মাধ্যবর্তী স্থানে বিশেষত প্যাংক্রিয়াসের জায়গাতে খাবার খাওয়ার আধঘণ্টা পর থেকে একটা অস্বস্তি শুরু হয় এবং তখন মনে হয় খানিকটা খেলে এই সমস্যা বুঝি-বা কমবে। খাবার খেলে ব্যথা চলে যায়। এটি পাকস্থলী আলসারের কারণে হয়। তবে ক্ষুদ্রান্তের নীচে আলসার হলে খাওয়ার পরও চিনচিনে একটা ব্যথা হতে থাকে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় পেটের আলসার নিরাময় সম্ভব।

যোগাযোগ : ৯৮৩০৫০২৫৪৩

লে লে বাবু ছ' আনা

আদিনাথ ব্রহ্ম

সম্প্রতি বহুল প্রচারিত একটি বাংলা দৈনিকের দিল্লিস্থিত কলমচি তাঁর সাপ্তাহিক রাজনৈতিক ভাষ্যে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখে বসলেন— 'দুধ সাদা পোশাকের সঙ্গে তার দুধে-আলতা পায়ে সাদা চটিজোড়াটিও মানিয়েছে বেশ।' রাজনৈতিক ভাষ্য লিখতে বসে এমন নির্লজ্জ ব্যক্তি-চাটুকারিতার নজির বোধকরি সাংবাদিকতার ইতিহাসে কমই আছে। এহেন সাংবাদিকটি নরেন্দ্র মোদীর ঘোর সমালোচক। ঈশানকোণে মেঘ জমলেও তিনি নরেন্দ্র মোদীরই দোষ দেখেন। এইসব সাংবাদিকের কীর্তিকলাপ দেখে, নয়ের দশকে বাংলাদেশে নির্বাচনের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে কিছু স্মৃতি আবার মনে ভেসে উঠছে। নয়ের দশকে বাংলাদেশে ওই নির্বাচনে সংবাদ সংগ্রহ করতে যখন যাই, তখন হুসেইন মহম্মদ এরশাদের জমানার সদ্য অবসান ঘটেছে। দেশব্যাপী প্রবল এরশাদ বিরোধী হাওয়া। এরশাদের পর প্রধানমন্ত্রী কে হবেন খালেদা জিয়া না শেখ হাসিনা— সেই নিয়ে তখন বাংলাদেশ জুড়ে প্রবল জল্পনা। এরশাদ জমানার নানা অকথিত কাহিনি তখন প্রকাশ পাচ্ছে। তা নিয়ে নানানরকম পুস্তক পত্রপত্রিকা তখন প্রকাশিত হচ্ছে। ওইরকম একটি পুস্তকই তখন বাংলাদেশের বিখ্যাত ২১ ফেব্রুয়ারির বইমেলায় নজর কেড়েছিল। বইটির নাম 'এরশাদের ভাউড়া।' ভাউড়া একটি গ্রাম্যশব্দ। ভাউড়া শব্দটির অর্থ নিকৃষ্ট শ্রেণীর দালাল। এই বইটিতে বাংলাদেশের জনা তিরিশেক সাংবাদিকের কীর্তিকলাপ বর্ণিত হয়েছিল। লেখা হয়েছিল, এরশাদের আমলে শুধুমাত্র এরশাদের অন্ধ স্তাবকতা করার পুরস্কারস্বরূপ এই সাংবাদিকরা কীভাবে নানাবিধ অবৈধ কারবার করার ঢালাও সুযোগ পেয়েছিলেন। কীভাবে এই সাংবাদিকরা অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জন করেছিলেন, কীভাবে ঢালাও দুর্নীতি করেছিলেন— সব কিছুরই তথ্য-সহ বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে এই বইতে। আশ্চর্য হয়েছিলাম এই দেখে যে, যেসব সাংবাদিকের নাম এই বইতে উল্লেখ করা হয়েছিল, তারা কেউই এর প্রতিবাদ করেননি। বরং, এরশাদের পতনের পর এই সাংবাদিকরা ঘরে গিয়ে লুকিয়েছিলেন। অথচ, এরশাদ অপসারিত হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত এরা এরশাদের গুণকীর্তন করে গিয়েছিলেন। এই সাংবাদিকদের বিষয়ে যখন বাংলাদেশের অন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তখন লক্ষ্য করেছিলাম কী অসীম বিতৃষ্ণা এদের প্রতি অন্যদের। অন্যরা সকলেই বলেছিলেন— এরশাদের নির্লজ্জ চাটুকারিতা করতে গিয়ে এই সাংবাদিকরা নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন।

নির্লজ্জ চাটুকারিতাতে অবশ্য হালে এখানকার সাংবাদিকরাও পিছিয়ে নেই। লেখার শুরুতেই যে বিশিষ্ট কলমচির কথা উল্লেখ করেছি, সেই তিনি এবং আরও কয়েকজন সাংবাদিক বছর কয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরসঙ্গী হয়ে রোমে গিয়েছিলেন। সেই সময়কার একটি ভিডিও পরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সেই ভিডিও-তে দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী হাততালি দিয়ে গান শেখাচ্ছেন, আর ওই স্তাবকসদৃশ সাংবাদিকরা সোনামুখ করে কোরাসে গান গাইছে। পরে ওই সফররত সাংবাদিকদের একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—ভাই, এর আগেও তো অনেক মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হয়ে সাংবাদিকরা দেশ-বিদেশে ঘুরেছে। আমার নিজেরও সে অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু অতীতে তো কখনো এমন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো বেসুরে গান গাইতে হয়নি। শুনে সাংবাদিকটি আঁতকে উঠে বলেছিলেন— 'আরে, গলা না মেলালে দিদি (পড়ুন মুখ্যমন্ত্রী) রেগে যাবেন যে। তার চেয়েও বড় কথা তিনি যদি অফিসে কমপ্লেন করেন, তাহলে আমার চাকরি যাবে।' এখানে একটু ছোট্ট করে বলে নিই, গত বছর মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসাবে লন্ডনে গিয়ে এমনই এক কীর্তিমান সাংবাদিক তারকা হোটেলে রুপোর চামচ চুরি করেছিলেন। পরে ধরা পড়ে গিয়ে পঞ্চাশ পাউন্ড জরিমানা দিয়ে রক্ষে পান। এই কীর্তিমান সাংবাদিকটি যে সংবাদপত্রে কাজ করেন, সে সংবাদপত্রের 'হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সংস্কৃতিবান' মালিকটি আবার মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহাস্পদ হিসেবে পরিচিত। আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ নিউটাউনে

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (যা অবশ্যই লাভজনক) করার জন্য তিনি সরকারের কাছ থেকে জমিও পেয়েছেন।

এসব প্রসঙ্গ পরে। বরং মূল বিষয়ে আসি। গত কয়েকবছর ধরে দেখা যাচ্ছে, বেশ কিছু সংবাদপত্রের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়, প্রত্যহ এইসব সংবাদপত্রের অনেকটা জায়গা ব্যয় হচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনায়। কেন? নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী। প্রায় পাঁচ বছর একটি সরকার চালাচ্ছেন তিনি। সরকারের সমালোচনা সংবাদপত্র করবে, তার ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেবে— সেটাই স্বাভাবিক। গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে সেটিই তার কাজ। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর ক্ষেত্রে বিষয়টি তেমন হচ্ছে না। গঠনমূলক সমালোচনার বদলে ব্যক্তিগত অসূয়াই প্রকাশ হয়ে পড়ছে এখানে। যেমন, একজন কলমচি লিখে বসলেন সম্প্রতি— 'পূর্বতন প্রধানমন্ত্রীরা বিদেশ সফরে সাংবাদিকদের সঙ্গী করতেন। নরেন্দ্র মোদী করেন না।' অতএব নরেন্দ্র মোদী খারাপ। গত বছর একটি আলোচনা চক্রে যোগ দিতে এবং এবছর কয়েক মাস আগে বাঙালিদের একটি সংগঠনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দিল্লিতে গিয়ে ঠিক এই বিষয়টি নিয়েই আলাপ হচ্ছিল দিল্লিবাসী বিশিষ্ট কয়েকজনের সঙ্গে। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার আলোচনা হয়েছে ঘন ঘন দিল্লি-মুম্বই-কলকাতা করা এক উদ্যোগপতির সঙ্গেও। দুটি বিষয়ের দিকে এরা আলোকপাত করেছেন। এক— একেবারেই ব্যক্তিগত কারণে কিছু কিছু সাংবাদিক নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা করছেন। কংগ্রেস জমানায় এই সাংবাদিকরা নানাবিধ অবৈধ কাজকর্ম করার ঢালাও সুযোগ পেতেন। নরেন্দ্র মোদী এদের সে সুযোগ দিতে নারাজ। অতএব মোদী বিরোধিতা। আর একটি কারণ হলো— প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই মোদীর বিরোধিতা করা। যেমন এনডি টিভি। এদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মোদী বিরোধিতার কারণ হলো— এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকপক্ষ হয় কংগ্রেস অথবা বামপন্থীদের ঘনিষ্ঠ। কংগ্রেসি এবং বামপন্থীদের কাছ থেকে নানাবিধ আর্থিক এবং অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকতা এরা পেয়ে এসেছে বরাবর। এই আমলে সেই পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণেই এরা মোদী বিরোধী। এদের একটিই লক্ষ্য— যেনতেন প্রকারে নরেন্দ্র মোদীকে বিদায় করে কংগ্রেস-বামপন্থীদের ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা। তার জন্য এরা যে কোনোরকম কুৎসা রটনা এবং মিথ্যা প্রচারে পিছপা নয়।

ব্যক্তিগত অসূয়ায় যে সাংবাদিকরা এখন মোদী বিরোধিতায় নেমে পড়েছেন, তাদের প্রকৃত রূপটি কেমন? একটি উদাহরণ দিই। একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিকের এক সাংবাদিক সম্পর্কে একদা কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কের একটি জনসভায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত পাঁজা প্রকাশ্যেই টাকা নেওয়ার অভিযোগ এনেছিলেন। সাংবাদিকটি এর কোনো প্রতিবাদ করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর স্বভাবটিও বদলায়নি। এরপর দিল্লিতে তিনি জাঁকিয়ে বসার পর কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক থেকে ব্যবসায়ীদের নানারকম সুযোগ-সুবিধা আদায় করে দেওয়ার বদলে 'কাটমানি' খেতেন বলে দিল্লির সাংবাদিক মহলেই রটনা আছে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার দিল্লিতে ক্ষমতায় থাকাকালীন বিজেপির এক বর্ষীয়ান মন্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পরিচয় ভাঙিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নানারকম সুযোগ-সুবিধাও নিয়েছেন বলে শোনা যায়। এমনও শোনা যায়, ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের পয়সায় তাঁর বেশ কয়েকবার সস্ত্রীক বিদেশ ভ্রমণও হয়েছে। এই সাংবাদিকটি এখন মোদী-বিরোধী। ফি সপ্তাহ নরেন্দ্র মোদীর মুণ্ডপাত করে কলম না লিখলে তার স্বস্তি হয় না। কারণ, নরেন্দ্র মোদী তাঁর এই করেকম্মে খাওয়াটি গত চারবছরে একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন।

আর একজন সাংবাদিকের উদাহরণ দেওয়া যাক। তিনিও একটি বহুল প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্রের দিল্লিস্থিত সাংবাদিক। তিনি আবার অতি বাম এবং সেই সঙ্গে রাহুল গান্ধী ঘেঁষা সাংবাদিক। আপাতদৃষ্টিতে নিজের একটি বিপ্লবী ভাবমূর্তি তৈরি করে রাখেন। ফি সপ্তাহে ইন্টারনেট ঘেঁটে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ের দরিদ্র গ্রামবাসীদের কাহিনি লিখে সূক্ষ্মভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন— একমাত্র রাহুল গান্ধী ক্ষমতায় এলেই এই দেশটি দুগ্ধ মধু প্রবাহী দেশে পরিণত হবে। তো, এহেন বিপ্লবী সাংবাদিকটি নাকি দিল্লির এক প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতার মাধ্যমে নানাবিধ উপঢৌকন পেয়ে থাকেন। এক কংগ্রেস নেতার বেনামি এনজিও-তে তাঁর স্ত্রীর একটি বড় মাইনের চাকরিও জুটেছে। অতএব, মোদী বিরোধিতা না করে তার উপায় কী?

দিল্লিতে কংগ্রেস আর এই রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই সব সাংবাদিক এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে হাত করেছেন। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, এদের মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কুৎসা এবং অপপ্রচারকে আরও তুঙ্গে নিয়ে যাওয়া। সেইসঙ্গে রাহুল গান্ধীর ইমেজকে ঘষামাজা করে জনসমক্ষে উপস্থিত করা। যে কারণেই মোদী নিন্দার পাশাপাশি রাহুল স্তুতি করতেও এদের জুড়ি মেলা ভার। রাহুল গান্ধীর দুধে আলতায় পায়ে সাদা চটি জোড়া মানিয়েছে দেখে এরা মুগ্ধ হয়ে পড়েন। কর্ণাটকে রাহুলের নেতৃত্বে কংগ্রেস সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েও, পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় ফিরে এলে তাকেই এঁরা রাহুলের কৃতিত্ব বলে বড় গলা করে প্রচার করেন। এই নির্লজ্জ প্রচারের জন্য অবশ্য কংগ্রেসকেও কিছু দিতে হয় এদের। গত এপ্রিল মাসে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এক বাঙালি আমলার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন— 'এই সাংবাদিকদের রেট কত জানেন? মাসিক ৫০ হাজার থেকে আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত। যে যেমন দরের সাংবাদিক, তার সেরকম রেট। এইরকম কুড়ি জন সাংবাদিকের একটি তালিকা আছে কংগ্রেসের কাছে। সেই তালিকা অনুযায়ী মাসোহারা পৌঁছে যাচ্ছে।'

এই রাজ্যের ক্ষেত্রে আবার বিষয়টি কিঞ্চিৎ অন্যরকম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু সাংবাদিককে নানাবিধ উপঢৌকনে খুশি করে তাঁবে এনেছিলেন। পরে বুঝলেন, সাংবাদিক নয়, সংবাদপত্রের আসল ক্ষমতা সংবাদপত্র মালিকদের হাতে। ফলে, সংবাদপত্রকে কবজা করতে হলে মালিককে কিনে ফেলতে হবে। গত কয়েকবছরে এই মালিকদের কিনে ফেলার কাজটিই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে করেছেন। কী রকম? উদাহরণ দিই। কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি বহুল প্রচারিত বাংলা দৈনিকের এক সাংবাদিক দুঃখ করে বলছিলেন, 'আগে খবর লিখে মাইনে পেতাম। এখন খবর চেপে যাওয়ার জন্য মাইনে পাই।' খবর সংগ্রহ করেও তা করতে না পারার বেদনা যে কী—তা একজন সাংবাদিক ব্যতীত কেউ বুঝবে না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, ওই কাগজে এখন সেনসরশিপ চলছে। কাগজের মালিকরা হুকুম জারি করেছেন--- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটিও শব্দ লেখা যাবে না। বরং রোজ নিয়ম করে বিজেপি এবং মোদীর মুণ্ডপাত করতে হবে। কী খবর যাবে না যাবে— তা নবান্ন থেকে রোজ বলে দেওয়া হচ্ছে কাগজের এক মালিককে। কাগজের ঠুঁটো জগন্নাথ স্বরূপ সম্পাদকের নামে প্রতি সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশস্তিমূলক লেখা বেরুচ্ছে। যদিও লেখাটি তিনি নিজে লিখছেন না। অন্যের লেখা নিজের নামে প্রকাশ করার

মতো অনৈতিক কাজটি করে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর প্রসাদ লাভ করছেন। এই কাগজের মালিক গোষ্ঠীকে কীভাবে হাত করল শাসকপক্ষ? ওই গোষ্ঠীর এক মালিককে বেআইনি নির্মাণে এবং জমি বাড়ির ব্যবসায় অন্যায় মদত দিচ্ছে শাসক গোষ্ঠী। সঙ্গে নানাবিধ আমোদ প্রমোদ। রাজ্যের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর মা অসুস্থ হয়ে পড়লে এই মালিকটি হাসপাতালে রাতও জেগেছে। কাগজের সম্পাদকও মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফরের ভ্রমণসঙ্গী। এই কাগজেরই এক সাংবাদিক, যিনি তোলাবাজদের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে একদা বিধাননগর পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন, পরে শাসক দলের এক প্রভাবশালী নেতার হস্তক্ষেপে ছাড়া পান— তিনিই এখন কাগজে ছড়ি ঘুরিয়েদের অন্যতম।

কলকাতার আর এক বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের মালিক গোষ্ঠীর একজনকে তো মুখ্যমন্ত্রীর চক্ষুশূল হওয়ায় কার্যত সম্পাদকের পদ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করা হয়েছে। বদলে ওই গোষ্ঠী রাজ্য সরকারের ঢালাও বিজ্ঞাপনের বদান্যতা লাভ করেছে। ওই গোষ্ঠীর অন্যসব ব্যবসাতেও এর ফলে সরকারি বদান্যতা মিলছে বলে খবর। ওই সংবাদপত্র গোষ্ঠীরই এক সাংবাদিককে একবার প্রকাশ্যেই প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র কংগ্রেস দপ্তরে টাকা নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিলেন। কোনো প্রতিবাদ করতে পারেননি সাংবাদিকটি। বরং, তারপরও এই সাংবাদিক সম্বন্ধে নানা মহল থেকে নানা অভিযোগ উঠেছে। এহেন কীর্তিমান সাংবাদিকও এখন মমতা বন্দনায় কাগজের পাতা ভরিয়ে দিচ্ছেন। কলকাতার আর একটি সংবাদপত্র গোষ্ঠীর দুই মালিক পিতা এবং পুত্র— উভয়কেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদ সদস্য বানিয়েছিলেন। পুত্রটির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, তিনি তাঁর তৎকালীন বেতনভোগী এক সাংবাদিককে সঙ্গে নিয়ে সারদা অর্থলগ্নি সংস্থার কর্তা সুদীপ্ত সেনকে কার্যত ভয় দেখিয়ে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়তে এবং মোটা টাকা দিতে বাধ্য করেছিলেন। পরে অবশ্য এই পুত্র সারদা কাণ্ডে কারাবাস করেন এবং সাংসদ পদটিও ছেড়ে দেন। আর এক সর্বভারতীয় গোষ্ঠীদ্বারা প্রকাশিত এক বাংলা সংবাদপত্রের মোদী-বিরোধী কলমচি সারদা কাণ্ডে দু-দু'বার সিবিআইয়ের তলব পেতেই 'দিদি'-র চরণতলে আশ্রয় নিয়েছেন। দিদি বন্দনা এবং মোদী বিরোধিতা না করে উপায় আছে?

তবে, তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে গিয়েছে একদা র‍্যাডিকাল বামপন্থী হিসেবে পরিচিত

কলকাতার একটি সংবাদপত্র গোষ্ঠী। এই সংবাদপত্রের যিনি সম্পাদক, শোনা যায়, একসময় নকশালপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নাকি যোগাযোগ ছিল। বামফ্রন্ট আমলে এই কাগজটি বামফ্রন্টের বড় সমর্থক। ছিল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গেও এই সম্পাদকের সুসম্পর্ক ছিল। জমানা বদলের পর এই কাগজ এখন বর্তমান শাসকদলের বড় সমর্থক। অনেকে বলেন, ভবিষ্যতে জমানা বদলালে কাগজের চরিত্র আবার বদলে নিতেও দ্বিধা করবেন না এই একদা বিপ্লবী সম্পাদক।

এই ঘটনাগুলি পাঠ করে কী বুঝলেন? এটুকু তো বোঝা গেল যে, সংবাদপত্রের প্রকৃত আদর্শ এবং লক্ষ্য থেকে এরা বিচ্যুত হয়েছে। এরা যা করছে তা স্রেফ ব্যক্তিস্বার্থে। ফলে মিথ্যা, কুৎসা প্রচার করতেও এদের বিবেকে বাঁধছে না। ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসটি অতীব উজ্জ্বল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং জাতীয়তাবোধে দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেই এদেশে সংবাদপত্রের পথচলা শুরু। এমনকী জরুরি অবস্থার কালো দিনগুলিতেও সংবাদপত্র স্বধর্ম রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু আজ? অর্থ এবং নানাবিধ প্রলোভনে নিজের কলম বেচে দিয়ে এসে এরা প্রমাণ করেছে— যে কোনো মূল্যেই এদের কিনে নেওয়া যায়। এরা প্রকৃত সংবাদসেবী নয়। এরা 'লে লে বাবু ছ' আনা।' ■

লিবারেল সাংবাদিকদের নরেন্দ্র মোদী বিদ্বেষ
কিছু কথা ও কিছু কাহিনি

নিবারণ চক্রবর্তী

কালোবাজার কারবারি। ভুয়ো লগ্নি সংস্থার মালিক। অসাধু ব্যবসায়ী। সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবী। সুবিধাভোগী সুযোগ সন্ধানী সাংবাদিক। —সকলেরই মুখে এক রা। চরম দুর্দিনের ঘোষণা। প্রত্যেকের একটাই প্রশ্ন— আচ্ছে দিন কোথায়?

পালে হাওয়া বাড়াতে সকলে এখন এক ছাদের তলাতে আসতেও প্রস্তুত। শুধু তাই নয়, সংবাদপত্র দেখলে বোঝার উপায় নেই দেশে কোনও অগ্রগতি হচ্ছে বলে। সেই সঙ্গে এখন শহুরে মাও ভক্তদের সম্মিলিত হইহই রব। সংবিধানের সুবিধে নেবে। সুযোগ খুঁজবে সংবিধান সরিয়ে ফেলার। প্রশ্ন করলে বা গতানুগতিক ধারা থেকে অন্য কিছু করলেই সকলের গেল গেল রব।

অথচ, সাধারণ মানুষের অভিযোগ নেই। অনেকটা মায়ের থেকে মাসির দরদ বেশি গোছের কান্নাকাটি ওই পাঁচ প্রজাতির নাগরিকের। তাহলে কেন কলমচিদের একাংশ ইতিমধ্যেই দিস্তা দিস্তা লেখা শেষ করে ফেলেছেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করে। ভাবার বিষয়। লালমোহনবাবু হলে বলতেন— 'কালটিভেট করতে হচ্ছে বিষয়টা!'

আসলে, গত পাঁচ দশকের বিলাসিতা এখন চরম চ্যালেঞ্জের মুখে। সরকার নিয়মনিষ্ঠ হতে চাইলেই ত্রাহি ত্রাহি রব তুলছেন এই সব অনিয়মের সুবিধেভোগী কলমচি আর সাংবাদিকরা। প্রথম আঘাতটা এসেছিল নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অল্প কয়েকদিন পর।

কী সেটা? বিদেশ সফরে ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে সরকারি খরচে সাংবাদিকদের নিয়ে যাওয়ার বহু দশকের চলে আসা রীতির ইতি টানলেন। জানানো হলো, সফরসঙ্গী হওয়া যাবে, তবে তা ওই সংবাদ সংস্থাকে খরচ করে বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রথিতযশা লিবারাল সাংবাদিকরা প্রচণ্ড ক্ষুণ্ণ হলেও তখন টুঁ শব্দ করেনি। তবে, আঁতে যে লেগেছে তা ক্রমশ প্রকাশ হতে থাকে। ঘটনা হলো, বিদেশ সফরে একের পর এক সাফল্যে চোখ কপালে উঠছিল অনেকেরই। বড় পত্রিকা ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ফলাও করে খবর হচ্ছিল। তবে প্রত্যেকেই ভিতরে ভিতরে ফুঁসছিলেন। সুযোগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রবল অস্বস্তির আরও কারণ ছিল। চিরাচরিত চিন্তাভাবনার খোলস ভেঙে প্রধানমন্ত্রী এমন অনেক কিছুই করছিলেন যা এই সাংবাদিকদের অস্বস্তি বাড়াচ্ছিল। মানুষের কাছে নিজের দপ্তরকে পৌঁছতে সরাসরি নমো অ্যাপ তৈরি করেন। বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের মতামত সরাসরি নিতে এই অ্যাপ কাজে লাগতে থাকে। সংবাদমাধ্যমের উপর নির্ভরশীলতা প্রচণ্ড কমে যায়। 'প্রোথিতযশা', 'বিকশিত' সাংবাদিকরা তা অনুভব করতে থাকেন। তখন থেকেই বাড়তে থাকে হতাশা। এখন দেশ ফের একটা নতুন নির্বাচনের দোরগড়ায়। তাই এই দঙ্গল ফের মাফিয়াদের মতো একত্রিত হয়ে আক্রমণ শানাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে। আশায় বাঁচে চাষা। তাই এই বিশেষ সংবাদজীবীগুচ্ছ আশায় রয়েছেন যে, এ বার অন্তত ঠেকানো যাবে ওই 'মোদী' নামক এনিগমাকে। যারা মুক্ত চেতনার কথা বলে, তারাই বিপরীত মতকে কণ্ঠরোধ করতে

দু'মুহূর্ত ভাবে না। যখন 'আর্বান নাকশাল' নিয়ে 'বুদ্ধা ইন আ ট্রাফিক জ্যাম' সিনেমা বানিয়েছিলেন বিবেক অগ্নিহোত্রী, তখন কীভাবে জে এন ইউ (মুক্ত ভাবনার পীঠস্থান) এবং যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একাংশ শারীরিক নিগ্রহ করে তা নিয়ে কোনও কলমচি সরব হননি। সকলেই তখন সাময়িকভাবে বধির হয়ে গিয়েছিলেন।

পাঁচ বছর আগে এঁরাই নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হওয়ার পর বকলমে বাছাই বুদ্ধিজীবীদের হাত দিয়ে রীতিমতো বিজ্ঞাপন দিয়ে বিরোধিতা প্রকাশ করেছিল। ওই কলমচিদের কলম থেকেই এখন নানা ধারালো বাণ নিক্ষেপ হচ্ছে। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় সকলে খড়্গহস্ত হয়েছে। কারণ পাঁচ দশকের ক্ষমতার আসক্তি। এখন নেশার সামগ্রী বন্ধ। তাই এই সমস্ত কাজকর্ম। চিকিৎসকের পরিভাষাতে একে উইথড্রয়াল সিম্পটম বলা হয়। দরকার ওষুধ।

তাতে তাল মেলালেই ভালো। না হলেই মন্দ। এই প্রথা বন্ধ হওয়ার সময় এসেছে। ২০১৯ সালের নির্বাচনের ফলাফলের দিকে চাতকপাখির মতো তাকিয়ে এই বাছাই করা সংবাদজীবী বিদ্বজ্জনেরা। এ বার আরও একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে লোকসভা নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসবে ততই এই আক্রমণ তীব্র হবে।

কিন্তু সংবাদমাধ্যম যে নির্বাচনের ফলাফল থেকে বিচ্যুত তা বার বারই প্রমাণ হয়েছে। সাম্প্রতিকতম হলো, ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন। বামফ্রন্টের মানিক সরকারের হয়ে যে সংবাদজীবীরা গলা ফাটিয়েছিল, তাঁরাই এখন নরেন্দ্র মোদী সরকার নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণে ব্যস্ত। কারণ ওই একটাই— নিজেদের সুবিধে থেকে বঞ্চিত হওয়া। আগের সমস্ত সরকার সেই অন্যায্য সুবিধে মেটানোর চল জারি রেখেছিলেন। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সেই 'মাফিয়া' সম্পর্কচ্ছেদে উদ্যোগী হন। বিশ্লেষণ করে কী বের করছে? নোটবন্দিতে কী লাভ হলো নাগরিকদের। পেট্রোপণ্যে কত মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। কোন কোন ব্যবসায়ী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ফোটো সেসন করেছে। কেন বিদেশে পালালো ঋণ খেলাপি ধনকুবেররা। সবাটাতেই নরেন্দ্র মোদীর দোষ। কেরলে বন্যা তাতেও ভুয়ো খবর দিয়ে বাজার গরম করল ওই বাছাই করা কলমচির দল। অথচ, তাতেও যখন কিছু হলো না তখন নিজেদের আসল রূপ প্রকাশ করে মাও উগ্রবাদী যোগে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের হয়ে গলা ফাটানো শুরু করেছে। মনের সুপ্ত বাসনা ঝুলি থেকে বেরিয়ে এসেছে।

আর এ রাজ্যের প্রতিবাদীদের আবার চোখ কান সবই বাঁধা। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ওঁরা কিছু শুনতে পান না। কিছু দেখতে পান না। এমনকী বোবাও হয়ে যান। এক অদ্ভুত জাদুবলে ওই সমস্ত সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিককুলের ইন্দ্রিয়ের একাংশ অকেজো হয়ে যায়। সব কিছুর একটা নির্দিষ্ট ব্যবহারিক পদ্ধতি আছে। এছাড়া আরও বড় বিষয় হলো, কোনও সংবাদ সরকারের পক্ষে স্বস্তিদায়ক না হলেও আগেকার রীতি অনুযায়ী সরকারের কেউই আপোশ করে না। সংশোধনী থাকলে সেই সমস্ত সংবাদ প্রতিষ্ঠানকে ত্রুটি বিচ্যুতি স্মরণ করালেই হস্তক্ষেপ বলে হইহই করেন সুবিধেভোগীরাই। ফলে এই আস্ফালন চলবে বলেই অনুমান নানান মহলের।

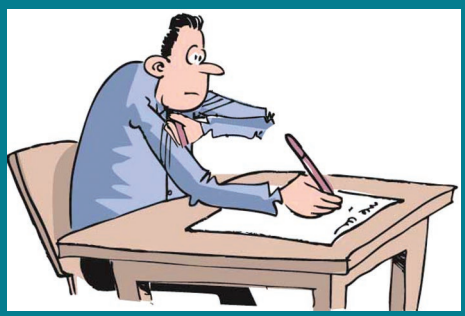

ঘোষালবাবু, আপনার জন্য

বাণেশ্বর ভট্ট

কেমন আছেন স্যার? আপনাকে অবশ্য এ প্রশ্ন করার কোনও অর্থই হয় না। কারণ আপনি প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিক। চব্বিশ ঘণ্টা বসে টইটম্বুর হয়ে না থাকলে চলবে কেন। উত্তর সম্পাদকীয় কলামে যেসব লেখা আপনি লিখছেন বুঝতে না পারলেও পড়ে বেশ আনন্দ পাচ্ছি। বুঝতে পারি না কারণ কয়েকটা জিনিসে দারুণ খটকা লাগে। অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে আপনি ছিলেন হিন্দুত্ববাদী, নরেন্দ্র মোদীর আমলে তা নন। বস্তুত তাঁবেদারি না করা আপনার পুরনো কাগজ ছেড়ে আপনি যে বাংলা ভাষার প্রথম শ্রেণীর দৈনিকটিতে এলেন, তার কারণই তো ছিল বিজেপি নেতাদের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা। এমনকী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বারাক ওবামার সাক্ষাৎকারের দিনও আপনি উপস্থিত ছিলেন। অথচ এখন আপনি কট্টর মোদী বিরোধী। মধ্যরাতে কুকুর ডাকলেও মোদীর বাপ-বাপান্ত করেন। এমনটা কেন হলো স্যার? ভরত ভূষণ যদি প্রেম চোপড়া হয়ে যায় তা হলে ভালো লাগে, বলুন?

আসলে স্যার আপনাকে বুঝতে পারি না বলেই আপনার লেখা বুঝতে পারি না। আমার এক মাস্টারমশাইকে বুঝিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলাম। তিনিও সাংবাদিক ছিলেন। এখন অবসর নিয়েছেন। আমার কথা শুনে বললেন, 'বড়ো হও তখন বুঝবে।' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আর কত বড়ো হব মাস্টারমশাই?' তিনি হাসলেন। হাসিটা ঠিক হাসির মতো নয়, বুঝলেন স্যার। আগে কখনও কারোর হাসিতে এমন যন্ত্রণা দেখিনি। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর তিনি বললেন, তোমার কি মনে হয়, বড়ো হয়ে গেছ? হওনি। যেদিন মায়ের বুকে ছুরি মারার সময় হাত একটুও কাঁপবে না, সেদিন বুঝবে বড়ো হয়ে গেছ।'

কিছু মনে করবেন না স্যার। মাস্টারমশাইয়ের বয়েস হয়েছে। তাই বোধহয় সত্যি কথা বলেন। কিন্তু তাতে কী! সবাই মিলে বললে মিথ্যের জোর সত্যের থেকেও বেশি হয়। কিন্তু মিথ্যের পাহাড় একদিন মিথ্যুকদেরই পা ধরে টেনে নামায় বলে শুনেছি। সাবধানে থাকবেন স্যার। পা ধরে টেনে নামানোর পর মানুষের আর কী থাকে, বলুন!

এই সময়

ক্ষত্রিয় ধর্ম

উনিশ জন জলমগ্ন মানুষকে উদ্ধার করলেন ভারতীয় বায়ুসেনার জওয়ানরা। অরুণাচল

প্রদেশের একাংশ বন্যার কবলে পড়ায় জওয়ানদের এই উদ্যোগ। জামপানি অঞ্চলের দুর্গত মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাবার জন্য বায়ুসেনার কাছে আর্জি জানিয়েছিল পূর্ব সিয়াং জেলার প্রশাসন।

কাপুরুষ

পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে লড়াই করে আর পেরে

উঠছে না। তাই তারা এবার নজর দিয়েছে জওয়ানদের পরিবারের সদস্যদের ওপর। সম্প্রতি নয়জন ব্যক্তিকে জঙ্গিরা অপহরণ করে যাদের পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ান।

সহযোদ্ধা

প্রয়াত নেতা এম. করুণানিধির সঙ্গে অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল।

বস্তুত ডি এম কে এবং ভারতীয় জনসঙ্ঘ জরুরি অবস্থার সময় ইন্দিরা গান্ধীর স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল। একথা বলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গড়করি।

সমাবেশ -সমাচার

চাঁচল বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে জ্ঞান-বিজ্ঞান মেলা

গত ১৮ আগস্ট বিদ্যাভারতীর মালদহ জেলার চাঁচল সঙ্কুলের জ্ঞান-বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয় চাঁচল বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে। পাঁচটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এই বিজ্ঞান

মেলায় অংশগ্রহণ করে। বিজ্ঞান মেলায় সভাপতিত্ব করেন চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক সুদীপ সোম। বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিদ্যাভারতীর সংগঠন সম্পাদক পার্থ ঘোষ, সহ সম্পাদক জগন্নাথ দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ। মেলায় শিশুদের তৈরি বিভিন্ন বিজ্ঞান-মডেল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সংস্কার ভারতী সিউড়ি শাখার বার্ষিক উৎসব

ললিতকলা ও সাহিত্যে সমর্পিত অখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সংস্কার ভারতী সিউড়ি শাখার উদ্যোগে গত ২৬ আগস্ট সন্ধ্যায় সিউড়ির জেলা গ্রামোন্নয়ন সভাগৃহে আয়োজিত হয় বার্ষিক উৎসব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

আয়োজিত উৎসবের নামকরণ করা হয়— 'নিত্য নব সত্য তব'। অনুষ্ঠানের সূচনায় সংস্কার ভারতীর ভাবসংগীত সহযোগে খুদে শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করে। সুচনা পর্বে মঞ্চে উদ্বোধকরূপে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা তপন গাঙ্গুলি। বিশেষ অতিথিরূপে অভিনেতা অর্ঘ্য মুখার্জি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়, সংস্কার ভারতীর কেন্দ্রীয় সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায়, প্রদেশ সম্পাদক ভরত কুণ্ডু, সংগীত শিল্পী ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্য, সভানেত্রী স্বপ্না চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। রাখি পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয় বনবাসী ভাই-বোনদের

এই সময়

বিমস্টেক

বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মালটি সেকটোরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকনমিক

কো-অপারেশন। সংক্ষেপে বিমস্টেকের অধিবেশন এ বছর বসেছে নেপালে। প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন এলাকার অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন আরও জোরদার করা হবে।

গ্রেপ্তার

জম্মু ও কাশ্মীরে চারজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতরা প্রত্যেকে হিজবুল মুজাহিদিনের

সদস্য এবং একটি হাওলা চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে পুলিশের অভিযোগ। গোয়েন্দাসূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে তাদের ধরা হয়েছে।

মহারাজ

অপেক্ষার পালা অবশেষে শেষ হলো। মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজী আন্তর্জাতিক

বিমানবন্দরের নাম বদল করে রাখা হলো ছত্রপতি শিবাজী 'মহারাজ' আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দু'বছর আগে মহারাষ্ট্র বিধানসভায় প্রস্তাবটি পাশ হওয়ার পর এ বছর কার্যকর করা হলো।

সমাবেশ -সমাচার

হাতে তৈরি রাখি, পাতার মুকুট, ভুট্টার খোলার ফুল, উত্তরীয় দিয়ে।

নটরাজ মূর্তির সম্মুখে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে বীরভূম জেলা ব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংস্থার শিল্পীরা পরিবেশন করেন গীতি আলেখ্য— 'মঙ্গল গাও আনন্দমনে'। ব্রহ্ম সংগীতের মাধ্যমে এই আলেখ্যর মাধ্যমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। গীতি আলেখ্যে ২০ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। সঙ্গে পর্দায় প্রোজেকশনের মাধ্যমে মহর্ষির জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাক্রম ফুটে ওঠে। সংগীত পরিচালনা করেন মৌ শুক্তি সরকার।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সংস্কার ভারতীর শিল্পীরা পরিবেশন করেন কবি জয়দেব-এর জীবন চরিত অবলম্বনে নত্যনাট্য 'হৃদি গোবিন্দম্' অথঃ জয়দেব চরিতম্। পরিচালনা করেন মৌমিতা বিষ্ণু সেনগুপ্ত।

কনক্লেভ অব কনসাস সিটিজেন্সের উদ্যোগে আলোচনা সভা

'অসম অমাদের পথ দেখিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও এন আর সি চাই। এটাই শেষ সুযোগ। না হলে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের অস্তিত্ব থাকবে না'— গত ৩১ আগস্ট কলকাতার দ্য বেঙ্গল চেম্বারস্ অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ম্যাকলিন মেগর সভাগৃহে কনক্লেভ অব

কনসাস সিটিজেন্সের উদ্যোগে রাখিবন্ধন উপলক্ষ্যে প্রবুদ্ধবর্গের আলোচনা সভায় কথাগুলি বলেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ তথা মানবাধিকার কর্মী ড. মোহিত রায়। অনুষ্ঠান শুরুর প্রাক্‌মুহূর্তে সবাইকে রাখি পরানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস। বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য তথা সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী ভূপেন্দ্র যাদব, শিলচরের বিশিষ্ট অর্থোপেডিক সার্জেন ডাঃ রাজদীপ রায়। বক্তরা নাগরিকপঞ্জির প্রয়োজনীয়তা, আইনি

এই সময়

প্রাকৃতিক গ্যাসে

লক্ষ্য তরল অ্যাসিটিলিন, এলপিজি এবং ফারনেস অয়েলের মতো বহুল প্রচলিত

জ্বালানিকে বিদায় দেওয়া। তাই ভারতীয় রেল এইসব ক্ষতিকারক জ্বালানির পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রেলের বিভিন্ন ওয়ার্কশপে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে।

রাজধর্ম

যেসব সরকারি কর্মচারী সাধারণ মানুষের সুবিধা অসুবিধার তোয়াক্কা না করে ধর্মঘট করছেন

তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিন। ঠিক এই ভাষায় উত্তরাখণ্ড সরকারকে নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। বিশেষ করে শিক্ষা জনস্বাস্থ্য পরিবহণ সেচ এবং রাজস্ববিভাগের কর্মীদের রেয়াত করা হবে না।

মিল বানচে

এরকম উদ্যোগ আগে কোথাও নেওয়া হয়নি। প্রকল্পটির নাম মিল বানচে। আয়োজক

মধ্যপ্রদেশ সরকার। দু' লক্ষ মানুষ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছেন। এরা শিক্ষার উপযোগী বইপত্র খাতা পেন্সিল সংগ্রহ করে স্কুলে স্কুলে সরবরাহ করবেন।

সমাবেশ -সমাচার

পদক্ষেপ, অসমের পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি নিয়ে যেভাবে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি চলছে সে বিষয়ে সচেতন করেন। সভাপতির ভাষণে ড. বিশ্বাস বলেন, পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলের প্রয়াস উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বঙ্গ নামটি ভারতের জাতীয় সংগীত ও শাস্ত্রগ্রন্থেও রয়েছে। সভায় পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজ্যপালকে একটি স্মারকলিপি দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সভা পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্ত এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক কল্যাণী কৃষিবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কল্যাণ চক্রবর্তী।

এবিভিপি-র উদ্যোগে কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা

গত ২৩ আগস্ট অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের

রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী। হাওড়া জেলার ৭৫টি বিদ্যালয় থেকে পাঁচশো কৃতী ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। সকলকেই সংবধর্না জানানো হয়।

কেরলের বন্যায় মহর্ষি দধীচি সেবাট্রাস্টের সহায়তা

সম্প্রতি কেরলের ভয়ংকর বন্যায় বন্যাদুর্গতদের সহায়তার জন্য কলকাতার মহর্ষি দধীচি সেবা ট্রাস্ট তাদের দধীচি ভবনে আয়োজিত এক বৈঠকে এক লক্ষ টাকা বাস্তুহারা

সহায়তা সমিতির তহবিলে দান করেন। অনুষ্ঠানে সেবা ট্রাস্টের কেশরদে তিওয়ারী, রামদেব কাকড়া, বংশীধর শর্মা, সীতারাম তিওয়ারী, বালকিসন আসোপা, প্রদীপ সুঁটওয়াল, ওমপ্রকাশ ডোবা, ইন্দ্রকুমার কাকড়া এবং বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির বিদ্যুৎ মুখার্জি, তপন গাঙ্গুলি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পাথুরিয়াঘাট মল্লিক বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধি উৎসব

সপ্তর্ষি ঘোষ

১৮৮৩ সালের একুশে জুলাই। বাংলা শ্রাবণ মাস। শুক্লা চতুর্দশী। প্রাক্ পূর্ণিমার সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নালোকিত প্রকৃতি। একটা গাড়ি এসে থামল উত্তর কলকাতার ৬৭ নম্বর পাথুরিয়াঘাট স্ট্রিটের বাড়ির সামনে। গাড়ির মালিক অধরলাল সেন। তৎকালীন দাপুটে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আরোহীদের মধ্যমণি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। সঙ্গে তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। যে বাড়িতে তাঁরা এলেন, সেই বাড়ির কর্তা যদুলাল মল্লিক। ঠাকুরের আগমনের উদ্দেশ্য, মল্লিক পরিবারের কুলদেবতা দেবী সিংহবাহিনী দর্শন।

এবার মল্লিক পরিবারের গৃহস্বামী যদুলাল মল্লিকের কিছুটা পরিচয় জেনে নেওয়া যাক। মল্লিক পরিবারের আদিপুরুষ মতিলাল মল্লিক ছিলেন অপুত্রক। তিনি যদুলাল মল্লিক (১৮৪০-১৮৯৪)-কে দত্তক নিয়েছিলেন। যদুলাল প্রখ্যাত বাগ্মী, সাবেক কলকাতা পুরসভার কমিশনার, তদানীন্তন কলকাতা শহরের অন্যতম ধনী ব্যক্তি। এ তো গেল তাঁর বাহ্যিক পরিচয়। যদুলাল ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একজন ঘনিষ্ঠ গৃহী পার্ষদ।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে আবার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে চলে আসি। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের নিয়ে ঠাকুরদালানে দেবী সিংহবাহিনীর পূজার স্থানে এলেন। চন্দন ফুল ও মালায় দেবী যেন চিন্ময়ী রূপে আবির্ভূতা। দেবী মূর্তির সামনে কৃত্রিম আলোর ঔজ্জ্বল্য। টাকা পয়সা ঠাকুরের কাছে ব্রাত্য, আবার দেবী দর্শনে এলে প্রণামী দিতে হয়। একজন ভক্তকে বললেন, টাকা দিয়ে প্রণাম করতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহবাহিনী-র সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। অনেকক্ষণ ধরে তিনি তন্ময় হয়ে মা-কে দর্শন করছেন। এভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় শ্রীরামকৃষ্ণ একেবারে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য প্রভায় সেদিন (১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই) পাথুরিয়াঘাট মল্লিক বাড়ির ঠাকুরদালান হয়েছিল বিভূষিত।

অবিকল পাথরের মূর্তির মতো তিনি নিস্পন্দ। নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, অপলক নয়নে। ভক্তরাও দেখছেন সেই দশ্য। এভাবেই অতিবাহিত হলো বেশ কিছুক্ষণ। তারপর একসময় শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। তাঁর সমাধি ভঙ্গ হলো। কেমন যেন নেশায় মাতোয়ারা তিনি। সিংহবাহিনীর উদ্দেশ্যে বলছেন, 'মা, আসি গো'।

দেবী দর্শনের পরে তিনি চললেন গৃহকর্তা যদুলাল মল্লিকের বৈঠকখানায়। ভক্তরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। বৈঠকখানায় যেতে যেতে ঠাকুর নিজের মনে বলছেন, 'মা, আমার হৃদয়ে থাক মা'। ভাবে মগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ বৈঠকখানায় ঢুকে গান শুরু করলেন, ''মাগো আনন্দময়ী আমায় নিরানন্দ করো না''। গান শেষ হলো। ভাবোন্মত্ত অবস্থারও কিছুটা অবসান হলো। এবার তিনি যদুলালকে বললেন, ''আমি মা'র প্রসাদ খাব''। মা সিংহবাহিনীর প্রসাদ এনে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেওয়া হলো। তিনি পরিতৃপ্তি সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করলেন।

এই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মরণে প্রতিবছর একুশে জুলাই ৬৭ নম্বর পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটে প্রাসাদোপম মল্লিক বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবসমাধি উৎসব যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহারাজবৃন্দ উৎসবে বক্তব্য রাখেন। এ উৎসবে হাজির থাকেন শহরের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে গীতিআলেখ্য পরিবেশিত হয়। সামগ্রিক ভাবে, সেদিন মল্লিকবাড়ির ঠাকুরদালানে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশ তৈরি হয়। ▮

প্রণাম আমিত্বের নাশ করে

অমিত ঘোষ দস্তিদার

নিজেকে মনপ্রাণ দিয়ে সঁপে দেওয়াই হলো প্রণাম। এই সঁপে দেওয়ার মধ্যেও ত্যাগী-নিরহংকারী-জ্ঞানপিপাসু এক হৃদয় যেন সবসময় কাজ করে। মনে রাখতে হবে শুধু জীব নয়, চিদচিৎ সমস্ত পদার্থই শ্রীহরির শরীর। সৃষ্টি পরম ব্রহ্ম। চৈতন্য ভাগবত বলছে, ওই বৈষ্ণবধর্ম সবার প্রণতি। গীতায় শ্রীভগবানের পুনঃ পুনঃ আদেশ— ''মাং নমস্কুরু''। নারদপুরাণ জানাচ্ছে—

''একোঽপি কৃষ্ণস্য কৃতপ্রণামঃ দশাশ্বমেধাভৃতের্নতুল্যঃ।
দশাশ্বমেধী পুনরেতি জন্ম কৃষ্ণপ্রণামী ন পুনর্ভবায়ঃ।।''

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে একটি প্রণাম পুনর্জন্ম নিবারণ করে, কিন্তু দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞকারীরও পুনর্জন্ম হয়। প্রণামের যে কী গভীর রহস্য এবং প্রণাম করা আমাদের কেন প্রয়োজন ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রী সত্যদেব তাঁর 'সাধন সমর' বা 'দেবী মহাত্ম্য' গ্রন্থের 'প্রণাম রহস্য ও অভিমান ত্যাগ' প্রবন্ধে সুন্দর ভাবে জানাচ্ছেন, 'আমি' বলিয়া যে জ্ঞানের বোঝা লইয়া জ্ঞানের গর্বে আমরা মাথা উন্নত করি, ওই আমিত্ববোধটিকে— ওই অজ্ঞানের ভাবটিকে জ্ঞানের সমীপে সম্যক্ অবনত করার নামই যথার্থ প্রণাম। স্বয়ং ভগবান বলেছেন— 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।'

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা, এই ত্রিবিধ উপায়ে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের নিকট হতে তত্ত্বজ্ঞান গ্রহণ করতে হয়। প্রণামের বিস্ময়কর মহিমা প্রসঙ্গে বর্ণনা করতে গিয়ে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীজ্যোতির্ময় নন্দ তাঁর 'জ্যোতির্ময় রচনাঞ্জলি' গ্রন্থের 'শ্রীনাম ও প্রণাম' নিবন্ধে লিখেছেন--- নববিধা ভক্তির মধ্যে অন্যতম বন্দনা ও প্রণাম। অর্চনাঙ্গরূপে বন্দনের বিধান থাকলেও কেবল বন্দনেরই মাহাত্ম্যখ্যাপনের জন্য ইহা অন্যতম ভক্তিরূপে নির্দিষ্ট আছে। কেবল বন্দনের দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যেতে পারে। এই বন্দন ত্র্যঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ এই ত্রিবিধ বিহিত আছে। তন্মধ্যে ভূমিতে দণ্ডবৎ হয়ে সাষ্টাঙ্গ বন্দনই সর্বশ্রেষ্ঠ।

ভারতবর্ষ বিশ্বের একমাত্র পথপ্রদর্শক। এই ভারতের গর্বিত গৃহীরা হলেন— জনক-যুধিষ্ঠির-রামচন্দ্র শিব-দধীচি-দিলীপ, কৃষ্ণ-ভীষ্ম-ধনঞ্জয়। ভারতবর্ষের আদর্শ নারীরা হলেন— সতী-সীতা- সাবিত্রী, দময়ন্তী-শৈব্যা-চিন্তা, গান্ধারী-কুন্তী-দ্রৌপদী, গার্গী-মৈত্রেয়ী- মদালসা। ভারতের গার্হস্থ্য জীবন হলো শ্রীভগবানের মন্দির, আনন্দের নিকেতন। স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-মিলনের নন্দনকানন— ভারতের পরিবার ও সমাজ। সহস্র যন্ত্রণার মধ্যেও একমাত্র ভারতবর্ষের মানুষই অন্তরে দৃঢ় সংকল্প গেঁথে রাখে— 'একথা রাখবো সদা মনে, ভক্তি করবো গুরুজনে।''

কালিকা পুরাণে ভগবান শ্রীশিব দেবী কামাখ্যার পূজা প্রসঙ্গে বেতাল ও ভৈরবকে নমস্কার প্রসঙ্গে যে কথাগুলি বলেছেন, তাতে সাতরকমের নমস্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলি হলো— ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, অর্ধচন্দ্রাকার, প্রদক্ষিণ, দণ্ড, অষ্টাঙ্গ এবং উগ্র। তিন দিক ভ্রমণ করে প্রণাম হলো ত্রিকোণ। ত্রিকোণাকারে দু'বার ভ্রমণ করে প্রণাম হলো ষট্‌কোণ, এটিকে শিব ও দুর্গার প্রীতিপদ ষট্‌কোণী নমস্কার বলা হয়। দক্ষিণ থেকে বায়ুকোণে গিয়ে সেখান থেকে দক্ষিণে ফিরে যে নমস্কার বা প্রণাম করা হয় তা হলো অর্ধচন্দ্রাকার। গোলাকারে একবার ঘুরে যে প্রণাম তাকে বলে প্রদক্ষিণ। পৃথিবীর ভূমিতে 'দণ্ড' অর্থাৎ লাঠির মতো শুয়ে— হৃদয়, চিবুক, মুখ, নাক, হনু, ব্রহ্মরন্ধ্র, অক্ষি, কর্ণদ্বয় দ্বারা ভূমিস্পর্শ করে যে নমস্কার তাই-ই হলো দণ্ড এবং অষ্টাঙ্গ বা সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। গোলাকারে তিনবার প্রদক্ষিণ করে ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে ভূমি স্পর্শ করে প্রণাম হলো— উগ্র। এটি প্রণামের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

তাত্ত্বিকব্যক্তিগণ নমস্কারকে কায়িক, বাচিক এবং মানসিক এই তিনভাগে ভাগ করেছেন। এইগুলি আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনভাগে বিভক্ত। ইষ্ট, মধ্য এবং অনিষ্টগত মন দিয়ে যে তিন রকমের নমস্কার করা হয় তাকে বলে মানস নমস্কার। মানস নমস্কারও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন ভাগে বিভক্ত।

হিন্দুসংস্কৃতিতে গাভীকে গোমাতা জ্ঞানে, ভগবতী রূপে শ্রদ্ধা-পূজা-প্রণাম করা হয়। তুলসী-বট-অশ্বত্থ ইত্যাদি গাছকে দেবদেবী জ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি-পূজা-প্রণাম করা হয়। শ্রীশ্রীশিবলিঙ্গ, শ্রীশ্রীনারায়ণ- শিলাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি-পূজা-প্রণাম করে পরমেশ্বর শ্রীশ্রীশিব- শ্রীশ্রীনারায়ণ স্বয়ং বিরাজমান বলে মান্যতা প্রদান করা হয়। প্রণাম যত সত্য হবে, প্রণাম যত সরলতাময় হয়ে উঠবে, প্রণাম যত কৃত্রিমতাহীন হবে ততই সহজ-শীঘ্র অভীষ্টলাভে চরিতার্থ হওয়া যাবে। প্রণামে অহংভাব নষ্ট হয়ে শ্রেষ্ঠত্বভাব জেগে ওঠে। প্রণামের দ্বারা চিত্ত উন্নতভাবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে ও অহঙ্কাররূপী মহাশত্রু নিপাতিত হয়। প্রণাম পবিত্র এক পরমাশ্রয়, যা আমিত্বকে অর্পণ করে, ফলে জীবন আনন্দময় হয়ে ওঠে। শ্রদ্ধা এবং সেবার দ্বারাই সুন্দর মন গড়ে ওঠে। সুন্দর মন গড়ে উঠলে সংসারও সুন্দর হয়ে উঠবে। সংসার যত সুন্দর হবে সমাজও তত সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হয়ে উঠবে। সমাজ সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হলে দেশও সুন্দরভাবে সুগঠিত হয়ে উঠবে। ▮

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

টি. এস. ইলিয়ট : (১৮৮৮-১৯৬৫)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক, আমেরিকা-জাত বিখ্যাত ব্রিটিশ কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক। ইনি ১৯৪৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিতাবলির মধ্যে অন্যতম, 'দ্য ওয়েস্ট লান্ডের' রচয়িতাও তিনিই।

উদ্ধৃতি : ভারতের মহান দার্শনিকদের সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় মতবাদের সামনে পাশ্চাত্যের বিখ্যাত দার্শনিকরা যেন পাঠশালার ছাত্রের মতো।

উদ্ধৃতি : বহু দিন পূর্বে আমি প্রাচীন ভারতীয় ভাষা (সংস্কৃত) শিখেছিলাম। সেই সময় আমি ভারতীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলাম। আমি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থগুলিও একটু আধটু পড়েছিলাম। আমি জানি যে, আমার কবিতাগুলির মধ্যে ভারতীয় সাহিত্যের অমোঘ প্রভাব পড়েছে।

উৎস : নোট্স টুয়ার্ডস দ্য ডেফিনেসন অব্ কালচার— টি.এস. ইলিয়ট।

বি.দ্র. : তিনি তাঁর 'দ্য ওয়েস্ট ল্যান্ড' নামক বিখ্যাত কবিতায় উপনিষদের তিনটি প্রধান গুণের কথা লিখেছেন— দত্ত্যা (ভিক্ষা দান), দয়াধ্যান (দয়া দেখান) আর দময়তা (আত্ম নিয়ন্ত্রণের অভ্যাস)। আধুনিক ধ্বংসমূলক জগতে এই তিনটি গুণেরই বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁর ওই বিখ্যাত কবিতাটির শেষ বাক্যটি হচ্ছে— ওম শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ।

রালফ ওয়াল্ডো এমারসন্ : (১৮০৩-১৮৮২)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন আমেরিকার অন্যতম প্রাবন্ধিক, লেখক, অধ্যাপক এবং একত্ববাদী ধর্মযাজক। তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে অতীন্দ্রিয়বাদের পুরোধাপুরুষ। তাঁর লেখাগুলি পড়ে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যেমন হেনরি ডেভিড থরো, ফ্রেড্রিক নিট্শে, উইলিয়াম জেম্স, এমিল আরমান্ড, এমা গোল্ডম্যান, মারসেল প্রাউস্ট এবং হারল্ড ব্লুম প্রমুখ মনীষী বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

উদ্ধৃতি : যেখানে সমস্ত কিছুই বিপরীতগামী, ব্রিটেনে বসে আমি এক অদম্য ইচ্ছায় প্রাচ্যের প্রজ্ঞার অনুসন্ধান করি। মিথ্যা অহমিকা ভরা জীবনে, ঐহিক জগতের ভোগবাদে, ত্রুটিপূর্ণ যান্ত্রিক জীবনে, ঈর্ষাকাতর ধ্যানধারণার মধ্যে, প্রাচ্যের ঔদার্যময় মহান দর্শনই মনে হয় একমাত্র প্রতিবিধান। আমি একটুও আশ্চর্য হইনি, যখন শুনেছিলাম যে, ওয়ারেন হেস্টিংসের মতো ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়ক ভারতীয় সাহিত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে এবং নিজের দেশের কুসংস্কারের সমালোচনা করে, ভগবৎ গীতার অনুবাদের প্রয়াসী হয়েছিলেন।

উৎস : ইংলিশ্ ট্রেইট্রস—রাল্ফ ওয়াল্ডো এমারসন।

কাউন্ট হেরম্যান কেসারলিং : (১৮৮০-১৯৪৬)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন এস্টোনিয়ার এক বিখ্যাত দার্শনিক। তিনি প্রথম গ্রহ-নক্ষত্র সংক্রান্ত বিষয়ের চর্চা শুরু করেন। তিনি 'স্কুল অব্ উইসডোমের প্রতিষ্ঠাও করেন।

উদ্ধৃতি : আমি আজকাল ইউরোপে বা আমেরিকাতে, ভারতের সমান অথবা সমতুল্য অন্য কোনও কবি, চিন্তাবিদ অথবা জনপ্রিয় লোকনেতার সন্ধান পাই না।

উৎস : দ্য ডিসকভারি অব্ ইন্ডিয়া— জওহারলাল নেহরু।

উদ্ধৃতি : আমরা জানি প্রাচীন ভারত সর্বোত্তম অধ্যাত্মবিদ্যা রচনা করেছিল। আর পাশ্চাত্যের তুলনায় দর্শনশাস্ত্রের উপর ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের কথা কে না জানে? ভগবৎ গীতা যা মহাভারতের মতো মহাকাব্য থেকে নেওয়া গীতিকাব্য, তা বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্ম বলে পরিচিত হয়েছে।

উৎস : দ্য কেস ফর ইন্ডিয়া— উইল ডুরান্ট অ্যান্ড সস্টার।

ড. আর্নল্ড জোসেফ টয়েনবি : (১৮৮৯-১৯৭৫)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ লেখক, সমাজ সংস্কারক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসকার। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৬১-এর মধ্যে তাঁর বিস্তারিত গবেষণা 'এ স্টাডি অব্ হিস্ট্রি' নামে ১২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

উদ্ধৃতি : আজ পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সারা বিশ্বকে সঙ্ঘবদ্ধ করেছে; সীমাকে অতিক্রম করেছে, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে আজ ভয়ানক মারণাস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করেছে। কিন্তু তারা পরস্পরকে বোঝার বা ভালবাসার কলাকৌশল জানে না। যদি আমরা এই ভয়ঙ্কর সঙ্কটকালে মানব জাতিকে বাঁচাতে চাই, তাহলে ভারতীয় পদ্ধতিরই শরণাপন্ন হতে হবে।

উৎস : হিন্দুত্ব ইজ ইউনিভার্সাল লভ—গিরিশচন্দ্র মিশ্র।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি।
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী,
নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

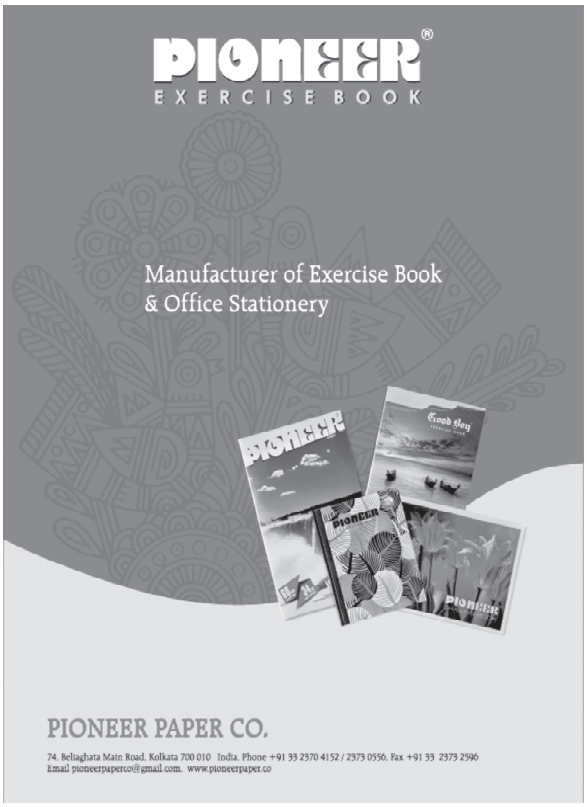

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

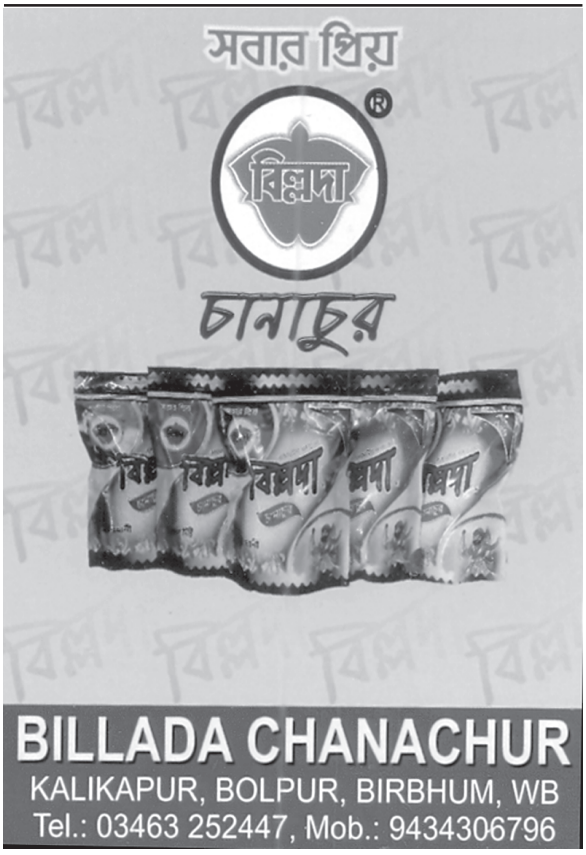

লক্ষ্মীর আগমন

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দিনগুলো খুব বিষণ্ণতায় কাটছিল দীপালির। দু'বছর হলো ওর বিয়ে হয়েছে। প্রথম সন্তান এসেছিল কিন্তু মৃত। খুব ভেঙে পড়েছিল সে। পাশের বাড়ির রমা বৌদি এসে ওকে তখন সান্ত্বনা দিত। একদিন স্থানীয় বাণেশ্বর শিব মন্দিরে ওকে নিয়ে গেল। ওরা মন্দিরে অনেকক্ষণ বসেছিল। ফিরে আসার সময় দীপালি কীরকম যেন পাগলের মতো হয়ে গেল। শিবলিঙ্গের গৌরীপট্টে মাথা রেখে মনে মনে বললে, 'এবার যদি সন্তান সুস্থ হয়ে জন্মায় তাহলে সে বাড়িতে গোরু পুষবে। নিজে হাতে দুয়ে সেই গোরুর দুধ বাণেশ্বরকে উৎসর্গ করবে'। বাড়ি ফিরে আসার পথে সে যখন রমাবৌদিকে কথাটা বলল রমাবৌদি শুনে খিলখিল করে হেসে ফেলল। তারপর বলল, 'দেবতোষ তোকে বাড়িতে গোরু পুষতে দেবে? বাড়িতে গোরু পোষার কত হ্যাপা জানিস।' দীপালি তখন জেদি স্বরে বলে, 'দ্যাখা যাক্'। এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে দীপালির একটা মেয়ে হয়েছে। মেয়ের নাম রেখেছে অপর্ণা। মেয়ে শিশু থেকে আস্তে আস্তে বড় হয়ে হাঁটতে চলতে শিখেছে। কথা বলতে শিখেছে। তারমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে। দীপালির মেজো মাসি মেদিনীপুরের ছবিরানিচকে থাকতো। তাদের কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। তারা দীপালিকে মেয়ের মতো দেখতো। সেই মাসি হঠাৎ একদিন মারা গেল। মেসোমশাই আগেই মারা গেছেন। দীপালি তাদের একমাত্র উত্তরাধিকারী। ফলে দীপালির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এখন বেশ ফেঁপে ফুলে উঠেছে। তার বাড়িতে ঠিকে কাজ করে মিনু। মিনুর বর রাজমিস্ত্রি। দীপালি একদিন মিনুকে ডেকে বলল, 'তোর বরকে কাল আসতে বলিস তো।' মিনু বলে, 'কেন গো

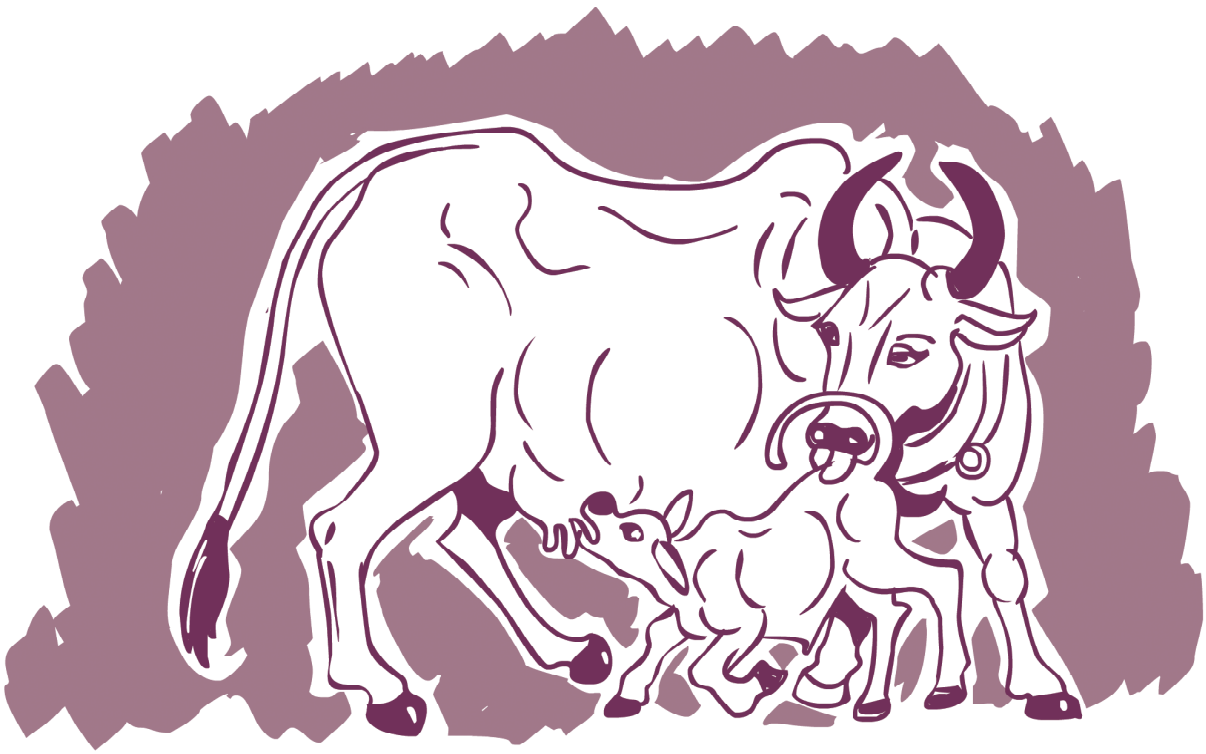

বৌদি বাড়ি সারাবে?' দীপালি বলে, 'না। বাড়িতে গোয়ালঘর বানাবো।'

মিনু চোখ কপালে তুলে বললে, 'কেন গো বৌদি গোরু পুষবে নাকি?' দীপালি বলে, 'হ্যাঁ।'

পরের দিন মিনুর বর এলে তার সঙ্গে দীপালি গোয়ালঘর বানানো নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করল। দরপত্র ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর কথা হলো দু'দিন পর কাজ শুরু হবে। দেবতোষকে রাতে কথাটা বলতে সে অবাক হয়ে বলল, 'বাড়িতে গোরু পোষার কী দরকার? এখন অনেক দোকানেই দুধের প্যাকেট বিক্রি হয়। আর বাড়িতে গোরু পুষলে বাড়ি নোংরা হবে। মশা, মাছির উপদ্রব বাড়বে। কী দরকার এত ঝামেলার?' দীপালি জেদ করে বলে, 'অনেক বাড়িতেই তো গোরু পোষে। তারা কী করে থাকে? আর বাড়িতে গোরু-বাছুর থাকলে লোকে বাড়ি পরিষ্কার করে রাখে।'

দেবতোষ বলে, 'তা কি গোরু পুষবে, জার্সি?' দীপালি বলে, 'না। আমার মাসতুতো বোনের ননদের বাড়ি গোরু আছে। পাটনাই গাই। তারা বলেছে সস্তায় দেবে। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে।'

দেবতোষ দীপালিকে বলে, 'এখন শহরে সব খাটাল তুলে দিয়েছে। আশপাশে কোথাও কোনো বিহারি গোয়ালা নেই। তাহলে গোরুর পাট কে করবে শুনি?' দীপালি তখন দেবতোষের গায়ে আলতো চিম্‌টি কেটে বললে, 'তোমার বউকে কী ভাবছ। সে সব কাজ পারে। মিনুর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। ওকে একটু বেশি মাইনে দেবো, ও গোয়াল পরিষ্কার করবে। গোরুর জাবনা তৈরি করবে। আর আমি বাকি কাজগুলো করব। গোরুকে চান করাব।' তারপর সে শূন্যে দুহাত তুলে দুধদোয়ার ভঙ্গি করে বলে, 'দু'বেলা দুধ দুইবো।'

দেবতোষ হেসে বলে, 'তুমি গয়লার মতো দুধ দুইবে?'

দীপালি বলে, 'মেজোমাসির বাড়ি ছবিরানিচকে প্রায়ই থাকতাম। মাসির বাড়ি গোরু ছিল। আমি মাসির সঙ্গে সঙ্গে গোরুর পাট করতাম। দুধ দুয়ে দিতাম। আমার গোরুর কাজ জানা আছে গো।'

দেবতোষ বলে, 'জানোতো এখন গোরু নিয়ে চারদিকে কীরকম তোলপাড় হচ্ছে। কাগজে এই নিয়ে রোজই খবর বেরোচ্ছে। টিভিতে দেখাচ্ছে। তুমি আবার এর মধ্যে গোরু পুষবে।'

দীপালি ঠোঁট বেঁকিয়ে একটা অবজ্ঞার ভঙ্গি করে বললো, 'দেখবে বাড়ির গোরুর দুধের টেস্টই আলাদা। তখন আর বাইরের জল মেশানো দুধ খেতে ইচ্ছে করবে না।'

দেবতোষ বললো, 'এখন দেখছি তোমার গোরু নিয়ে পাগলামি শুরু হয়েছে। সবসময় খালি গোরু-গোরু করে যাচ্ছ।'

গোয়ালঘর তৈরির কাজ শেষ হলে দীপালি মিনুর বরকে দিয়ে গোয়ালের পাশে একটা ছোট ঘর তৈরি করালো সেখানে গোরুর খাবার খড়, খোল, ভুষি থাকবে। কিছুদিন পর ওর মাসতুতো বোন ফোন করে বলল, 'সামনের রবিবার তোর বাড়ি গোরু যাবে। ওইদিন দেবতোষদার ছুটি থাকবে। তোর কোনো অসুবিধা হবে না।' এদিকে দেবতোষ দীপালিকে এই নিয়ে টিটকারি, রসিকতা করতেই থাকে। বলে, দেখা যাক ক'দিন তোমার গোরুবাতিক থাকে। গোবর আর চোনার গন্ধ কতদিন সয়।

বিকালের দিকে ট্রাকটা এসে বাড়ির সামনে হর্ন দিল। দীপালি পড়ি কী মরি করে দৌড়ালো। চারপাঁচজন লোক হইহই করে গোরু নামালো। সঙ্গে একটা বাছুরও আছে। মিনু, রমা বৌদি এসে দাঁড়ালো। এরপর দেবতোষ সব টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিতে লোকগুলো চলে গেল। গোরু-বাছুরকে উঠানে দাঁড় করানো হলো। সাজসরঞ্জাম আগে থেকে তৈরি ছিল। দীপালি কাপড় ছেড়ে পরিষ্কার কাপড় পরে বরণডালা নিয়ে 'বন্দে গৌমাতরম্' বলে গোরুকে বরণ করে গোয়ালে ঢোকালো। মিনু গোরুর খড়, খোল, ভুষি ছোট ঘরটায় সাজিয়ে রাখলো। দীপালি মিনুকে বললো, 'সন্ধ্যেবেলা আসবি, তোকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে যাবো। কেনাকাটা আছে। রমাবৌদি মিনুকে নিয়ে গোয়ালঘরে গিয়ে গোরু দেখতে লাগল। বললে, 'ভালোই করেছিস দীপু এই দেশি পাটনাই গোরু এনে। জার্সি গোরুগুলো আমার পছন্দ নয়। কিরকম জংলি জংলি মনে হয়।' গোরুটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে রমা বৌদি বলল, 'তোর গোরুটা কীরকম শান্ত, লক্ষ্মী। এর নাম রাখলুম লক্ষ্মী। দীপালি হেসে বলল, 'বেশ তো।' তারপর দীপালিকে বলল, 'মনে হয় তো অনেক দুধ দেবে। অতিরিক্ত দুধ আমি কিনবো'। দীপালি হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো।

সন্ধ্যাবেলা মিনু সেজেগুজে এলো, দীপালি তৈরি ছিল। মিনুকে নিয়ে বাজারে গেল। গোরু বাঁধার দড়ি কিনলো কয়েক গাছা। বাসনের দোকান থেকে একটা স্টিলের বালতি কিনলো দুধ দোয়ানোর জন্য। দু'একটা দুধ মাপার পোয়া কিনলো। কেনাকাটা শেষ করে ওরা রাতের দিকে বাড়ি ফিরে এল। দেবতোষ বললে, 'তাহলে তোমার গোমাতা অবশেষে এলেন।'

রাতে দীপালির বোন মিতালি ফোন করে বললে, 'কী তোর গোরু এসেছে?' দীপালি বলে, 'হ্যাঁ রে এসেছে।' মিতালি বলে, 'দেবতোষদা আর টোন-টিটকারি করছে না?' দীপালি বলে, 'হ্যাঁ, তা তো লেগেই আছে। বলে তোমার গোরুর শখ কতদিন থাকে দেখবো।' মিতালি বললে, 'তোর গোরুটা কীরকম রে। শান্তশিষ্ট না গুঁতোয়, শিং নাড়ে।'

দীপালি বলে, 'এখন তো সবে এসেছে, কয়েকদিন যাক। মনে হয় ঠাণ্ডাই হবে। নাম রাখা হয়েছে লক্ষ্মী। তবে বড়োসড়ো হৃষ্টপুষ্ট। বাঁট চারটে বেশ বড়ো আর ভারী। কয়েকবার টানতেই ছরছর করে দুধ বেরোল।'

মিতালি বললে, 'আরে ব্বাস! একদিন যাবো, গিয়ে দেখবো।' দীপালি বলে, হ্যাঁ।

মিতালি বলে, 'আজ রাখছি। পরে আরও কথা শুনবো।'

রাতে ওরা সবাই তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লো।

পরদিন একটু সকাল সকাল উঠতে হবে।

ভোররাতে একটা স্বপ্ন দেখে দীপালির ঘুম ভেঙে গেল। শুনলো গম্ভীর গলায় কে যেন ওর উদ্দেশে বলছে, ''কাল সোমবার। ভালো দিন। আমার মন্দিরে এসে দুধ দিয়ে যাস।'' দীপালি ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গিয়ে চোখেমুখে ভালো করে জলের ঝাপটা দিল। তারপর চাপা উত্তেজনায় আর ঘুম এল না। পরদিন ভোর হতে না হতেই সে রমা বৌদির বাড়ির গিয়ে খবরটা দিল। রমা বৌদি সব শুনে বললে, 'আর দেরি নয়। আমি বেলার দিকে চানটান করে পরিষ্কার হয়ে তোর বাড়ি যাবো। আর খোকাকে বলে দেবো রিক্সা নিয়ে তোর বাড়ির সামনে যেন হাজির থাকে। বাণেশ্বরের মন্দিরে যাবো। তুই সব রেডি রাখিস।' দীপালি বলে, 'ঠিক আছে।'

সকালে মিনু এসেই আগে গোয়াল পরিষ্কার করে। কাঠের মেজলায় জাবনা তৈরি করে। তারপর স্টিলের বলতিটা মেজেঘষে পরিষ্কার করে রান্নাঘরে উপুড় করে রেখে আসে। দীপালি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে রান্নাঘর থেকে স্টিলের বালতিটা নিয়ে গোয়ালঘরে ঢোকে। পিছনে পিছনে এসে মিনুও বলে, 'আজ বৌদির গাইদোয়া দেখবো।' মিনু বাছুরটা গোরুর সামনে ধরে দাঁড়ায়।

দীপালি গোরুর পেছনের পা-দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধে। প্রথম দোয়া হবে যদি পা ছোঁড়ে, বলা যায় না। এরপর হাঁটুগেড়ে বসে বাঁট থেকে টেনে টেনে দুধ দুইতে শুরু করে। দু-চারবার টানবার পর সরু তীক্ষ্ণ দুধের ধারা বালতিতে পড়তে থাকে। মিনু বলে, 'বৌদি গোরুর বাঁটে তোমার হাত ভালোই চলে।' দীপালি হেসে বলে, 'তুইও শিখে নে। আমার শরীর-টরির খারাপ হলে তুই এসব করবি।' মিনু বলে, 'ওরে বাবা, আমার ভয় করে। কোনোদিন এসব করিনি। দূর থেকে খাটালে গয়লাদের মোষদোয়া দেখতাম।' দীপালি দুধ দুইতে দুইতে মিনুর সঙ্গে গল্প করে। দীপালির মিনুকে খুব ভালো লাগে, মিনুও দীপালির খুব বাধ্য।

মিনু বলে, 'আচ্ছা বৌদি দাদা তো এসব গোরু-টরু পছন্দ করে না। তার কী হবে?' দীপালি বলে, 'এসব ওয়েস্টার্ন কালচারের ফল। এখন গোরুর পাট তো ক্রমশ উঠেই যাচ্ছে। লোকেরা এখন সব ফ্ল্যাটে থাকে। ফ্ল্যাট কালচার। সেখানে গোরু রাখবে কী করে? তারপর এখনকার জেনারেশনের অনেকেই গোরু বলতে নাক সিঁটকায়। গোরু মানেই গোবর আর গন্ধ। ওসব খাটালওলাদের কাজ। শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা এসব করে না। কিন্তু গোরুর কত উপকার আছে তা অনেকেই জানে না। আগেকার কালে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে গোরু থাকতো। আমাদের শাস্ত্রেও গোরুকে দেবতা বলে। তার শরীরে তেত্রিশ কোটি দেবতার বাস। গোরুকে মা বলে পুজো করা হয়। গোরু মানে শুধু দুধ দোয়া নয়।' মিনু শুনে বলে, 'তা ঠিক।' দীপালি আরও বলে, 'জানিস গোরুর বাঁটের পুঁজ থেকে পক্সের টিকা তৈরি হয়। আর গোমূত্র থেকে কত ওষুধ তৈরি হয়।' মিনু বলে, 'এতশত জানতুম না তো।' দুধদোয়া শেষ হলে দীপালি সফেন দুধভর্তি বালতিটা ঠাকুরঘরে রেখে থালা চাপা দেয়। দেবতোষ উঠানে দাঁড়িয়ে ব্রাশ করছিল। মিনু তাকে দেখে বলে উঠলো, 'দাদা, বৌদি আজ হাঁটুর ফাঁকে বালতি রেখে কেমন চ্যাকচোঁক্ করে দুধ দুইলো।' দেবতোষ বলে তুইও শিখেনে। মিনু হেসে ফেলল।

বেলা হলে রমাবৌদি একটা লালপাড় গরদের শাড়ি পরে এল। দীপালি ইতিমধ্যে মেয়েকে ঘুম থেকে তুলে তৈরি করে নিয়েছে। তিনজনে মিলে রিক্সায় করে বাণেশ্বরের মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দিল।

দুধের বালতিটায় ঢাকা থালার ওপর নতুন গামছা চাপা দেওয়া। কিছুক্ষণ পরে ওরা বাণেশ্বর শিবমন্দিরের সামনে এসে থামলো। রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে ওরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলো। পূজারি রমাবৌদির পরিচিত। রমাবৌদি তাকে সব বললে, পূজারি উত্তরে বললেন, 'আপনাদের ওপর বাবার অশেষ কৃপা'। দীপালি পূজারির হাতে দুধের বালতিটা দিলে তিনি সেই দুধ একটা পাত্রে ঢেলে বালতিটা ফেরত দিলেন। এরপর ওরা পুজোর জিনিসপত্র দিলে পূজারি বিগ্রহের উদ্দেশ্যে সেগুলি অর্পণ করে পুজো শুরু করলেন। রমাবৌদি, দীপালি ও ছোট্ট অপর্ণা মন্দিরের ভিতর পাশাপাশি বসলো। স্নিগ্ধ, পবিত্র মন্দিরের পরিবেশ। আজ দীপালিকে খুব সুন্দর লাগছে। একরাশ ঘন কালো চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর। কপালে একটা লাল টিপ। ওরা অনেকক্ষণ ধরে পূজা-অর্চনা দেখল। তারপর এক সময় পুজো শেষ হলে প্রসাদ, প্রসাদি ফুল, বেলপাতা নিয়ে সাষ্টাঙ্গে বিগ্রহকে প্রণাম করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল। দীপালির চোখে মুখে একটা পরিতৃপ্তির ছোঁয়া। দেবতার আশিসলাভ করে যেন ধন্য।

বিকালে হৈহৈ করে রমাবৌদি তাদের বাড়ি এল। 'আমার লক্ষ্মীরানি কোথায়' বলে গোয়ালে গিয়ে গোরুর পিঠে হাত বোলালো। দীপালি আর অপর্ণা দুজনে গোয়ালঘরে ঢুকলো। এবার দীপালি দুধ দুইতে বসলো। মিনু বাছুর ধরে লক্ষ্মীর সামনে দাঁড়িয়ে। অপর্ণা মায়ের পিঠে হাত রেখে অবাক চোখে দুধ দোয়ানো দেখতে থাকে। দীপালি বালতি থেকে দুধের খানিকটা ফেনা তুলে অপর্ণার গালে লাগিয়ে দেয়। অপর্ণা খিলখিল করে হেসে ওঠে। কিছুক্ষণ পরে দুধ দোয়ানো শেষ হলো। দীপালি রমা বৌদির আনা পাত্রে দুধ মেপে ঢেলে দিল। রমাবৌদি বলে, 'দীপুর মতো কর্মিষ্ঠ মেয়ে আর দেখা যায় না। এখনকার ক'টা মেয়ে এসব করবে বলো। তাদের প্রেস্টিজ যাবে।' শুনে দীপালি মৃদু হাসে। মিনু ওদিকে বাছুর ছেড়ে দিয়েছে। দীপালি তাকেও অনেকটা দুধ দিয়েছে। মিনু দুধ নিয়ে বাড়ি চলে গেছে। বাড়িটা এখন ফাঁকা। দীপালি রান্নাঘর থেকে এক গ্লাস দুধ গরম করে নিয়ে এসে গোয়ালঘরের সামনে অপর্ণাকে কোলে বসিয়ে সস্নেহে দুধ খাওয়াতে লাগলো। ওদিকে বাছুরটা ছাড়া পেয়ে তার মায়ের বাঁট থেকে একনাগাড়ে দুধ খেয়ে চলেছে। দীপালি পরমতৃপ্তির সঙ্গে তাকিয়ে রইল। তার মাতৃত্ব আজ যেন পূর্ণতা লাভ করলো। ■

ভালুক ও তার বন্ধুরা

সে আজ থেকে প্রায় কয়েক হাজার বছর আগেকার কথা। দক্ষিণ ভারত তখন ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা। সেখানকার এক জঙ্গলের রাজা ছিল এক সিংহমশাই। তার সঙ্গে থাকত তার ছেলে ছোটো সিংহমশাই। আর সেই বনে থাকত একটা ভালুক, একটা হাতি, একটা বাঁদর ছানা, একটা কাঠবেড়ালি, একটা হরিণ, একটা খরগোশ, একটা কাক আর দুটো ছোট্ট

চড়াইপাখির ছানা। সবাই মিলেমিশে খুব সুখে দিন কাটাত। সবাই একে অপরের খুব ভালো বন্ধু ছিল।

একদিন হয়েছে কী, রাত তখন খুব গভীর। মাঝ রাতে সবাই ঘুমুচ্ছে। ভালুক যাকে বনে সবাই ভল্লু বলে ডাকে, তার গেল ঘুম ভেঙে। কেননা মাঝরাতে তার খুব খিদে পেয়েছে। আর গুহাতেও তেমন খাবার মজুত নেই। ভাবতে ভাবতে ভল্লু গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ল। এদিকে তো ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে ভল্লু খাবারের সন্ধানে এগিয়ে চলল। সামনেই পড়ল একটা কলাগাছ। তাতে ছিল বেশ কয়েক কাঁদি কলা। পাকাকলা দেখেই ভল্লু আর লোভ সামলাতে পারল না। গাছ থেকে পেড়ে পেড়ে কলা খেতে লাগল আর খোসা চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলতে লাগল। রাতের অন্ধকারে সে দেখতে পেল না যে সব কলা শেষ হয়ে গেছে। তাই গাছটাকে ধরে খুব ঝাঁকাতে লাগল। শেষে গাছটাই উপড়ে মাটিতে পড়ে গেল। ভল্লু আর কিছু ভাবল না । তাই গুহায় ফিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত গড়িয়ে ভোর হলো। সকালবেলা বাঁদরছানা কলা খাবে বলে এ গাছ থেকে সে গাছে লাফাতে লাফাতে কলাগাছের দিকে চলল। উপর থেকে কলাগাছ না দেখতে পেয়ে নীচে নামল। আর নামতে গিয়েই কলার খোসায় পা হড়কে একেবারে চিৎপটাং। সেই অবস্থাতেই দেখল কলাগাছটা উপড়ে মাটিতে পড়ে আছে। আর নিজেকে সামলাতে পারল না। কলাগাছটাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

পাশের জমিতে মন দিয়ে গাজর খাচ্ছিল খরগোশ। কান্নার শব্দ শুনে এগিয়ে এসে দেখে বাঁদরছানা কলাগাছ জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।— কী হয়েছে, কী হয়েছে এত কাঁদছ কেন। —আর বলো না এই বনে একটাই কলাগাছ। আমরা সবাই ভাগ করে এটি থেকেই কলা খাই। দেখো কে যেন গাছটাকে উপড়ে ফেলে দিয়েছে। —এ তো মোটেই ঠিক নয়। চল আমরা রাজামশাইয়ের কাছে এর বিচার চাইবো। —এই বলে খরগোশ এগুতে গিয়ে কলার খোসায় পা হড়কে পড়ে গেল। দুজনেরই পা জখম। সেই অবস্থাতে তারা হাত ধরাধরি করে রাজামশাই সিংহের কাছে গেল। রাস্তায় হরিণছানার সঙ্গে দেখা হওয়ায় সেও এসেছে।

—রাজামশাই, রাজামশাই বাড়ি আছেন, বাঁদরছানা বলল। কে এত সকালে ডাকাডাকি করছ —বলে সিংহমশাই গুহা থেকে বেরিয়ে তাদের দেখে হতবাক। তারপর হরিণের কাছে সব ঘটনা শুনে রাজামশাই খুব দুঃখ পেলেন এবং বললেন— আমি এখনই সভা ডাকছি। হরিণছানা তুমি সবাইকে খবর দাও।

একে একে হাতি, কাক, চড়ুইছানা, কাঠবেড়ালি, এমনকী ভল্লুও চলে এল সভায়। রাজামশাই সবিস্তারে ঘটনাটা সবাইকে বললেন। খরগোশ ও বাঁদরছানার অবস্থাটাও সবাই দেখল। তারপর গম্ভীস্বরে রাজামশাই বললেন— আমি জানতে চাই কলাগাছ থেকে কে কলা খেয়েছে আর গাছটাকে উপড়ে ফেলেছে? নিজের দোষ স্বীকার করলে শাস্তিও কম হবে। রাজামশাই আদেশের সুরে বললেন।

আজ্ঞে, কাজটা আমি করেছি... কিন্তু বিশ্বাস করুন ইচ্ছে করে করিনি, বলল ভল্লু। —তুমি? তুমি এ কাজ কেন করেছ? তুমি তো খুব শান্ত আর ভালো, রাজামশাই বললেন। —আজ্ঞে আমার মাঝরাতে খুব খিদে পেয়েছিল। হাতের কাছে খাবার না পেয়ে সব কলা খেয়েছি আর বুঝতে না পেরে গাছটা উপড়ে ফেলেছি। আমায় ক্ষমা করুন। ভল্লু কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল।

—তুমি তো বরাবরই এরকম। মাথায় বুদ্ধি বলে তোমার কিছু নেই। হাতি রেগে আগুন হয়ে বলল। —আহা। ওভাবে বলো না। ওতো দোষ স্বীকার করেছে, বলল ছোটো সিংহমশাই। —আরে আপনি জানেন না। একটা মাত্র কলাগাছ এই বনে। ওই গাছ থেকে আমি আর বাঁদরছানা ভাগ করে কলা খাই। ভল্লু কেন খেল কলা। ওর তো মধু রয়েছে। আমরা তো ওর মধু খাই না, বলল বাঁদরছানা।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার তো প্রথম এ ঘটনা ঘটল। মাফ করে দেওয়াই যায়। আর ভল্লু তো আমাদের মধ্যে ছোটো, বললেন রাজামশাই। আমায় যা শাস্তি দেবেন আমি মাথা পেতে নেব, বলল ভল্লু। —তোমার শাস্তি হলো যতদিন বাঁদরছানা আর খরগোশ সুস্থ না হয় ততদিন তুমি ওদের দেখভাল করবে আর কলাগাছটা ভালোভাবে পুঁতে দেবে যাতে আবার ওর গোড়া থেকে নতুন গাছ বেরুতে পারে। একটা কথা সবাই মন দিয়ে শোনো, সবাই মিলেমিশে থাকবে যাতে নিজেদের মধ্যে কোনও সমস্যা না হয়, বললেন রাজামশাই।

সবাই বুঝল যে কারো খাবার নষ্ট করা উচিত নয় আর কলার খোসা চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলতে নেই। ফেললে পা হড়কে বিপদ ঘটতে পারে।

বৃষ্টি মজুমদার

ভারতের পথে পথে

নাগার্জুনকোণ্ডা

হায়দরাবাদ থেকে ১৬৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে ও বিজয়ওয়াড়ার ১৭৫ কিলোমিটার পশ্চিমে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত নাগার্জুনকোণ্ডা। অতীতে এর নাম ছিল পুল্লারেড্ডিগুডেম। বৌদ্ধ আচার্য নাগার্জুন থেকে এই নাম হয়েছে। তেলুগু শব্দ কোণ্ডা অর্থ পাহাড়। দেড় হাজার বছর লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা প্রাচীন বিজয়পুরী ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। এই নগরীর পত্তন হয় সাতবাহন রাজা বিজয় সাতকর্ণীর হাতে। এই বিজয়পুরী ছিল পাঁচশো বছর ধরে দাক্ষিণাত্যের মূল বৌদ্ধকেন্দ্র। এর মহাচৈত্যটি সম্রাট অশোকের তৈরি। ২৪৪ মিটার উঁচুতে ২৩ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে উঠেছিল এই বৌদ্ধ বিহার। মঠ, স্তূপ,বিহার, বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আজকের নাগার্জুনকোণ্ডার মূল আকর্ষণ বন্যার হাত থেকে শহর বাঁচাতে কৃষ্ণানদীতে বিশ্বের উচ্চতম বহুমুখী বাঁধ।

জানো কি?

- রাজা ভরতের নামানুসারে এদেশের নাম ভারতবর্ষ।
- গ্রিকরা নাম দিয়েছে ইন্ডিয়া।।
- প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুদের বাসভূমি বলে আর এক নাম হিন্দুস্থান।
- প্রতিবেশী দেশের সংখ্যা ৯টি। (চীন, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান)
- ভারত ও চীনে মধ্যে সীমারেখাকে বলে ম্যাকমোহন লাইন।
- ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমারেখাকে বলে র‍্যাডক্লিফ লাইন।

ভালো কথা

কাকের কষ্ট

সেদিন সকালে খেলার জন্য মাঠে ঢুকতেই কাকগুলো কা কা করে চিৎকার জুড়ে দিল। আমরা বুঝতে পারছিলাম না। শুভমদা খেলা করাচ্ছিল। কাকগুলো মাঝে মাঝেই চিৎকার করে আবার উড়ে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ আমার নজরে এল প্যান্ডেলে দুর্গাপ্রতিমার কাঠামোর ভিতরে একটা কাক ঝুলে আছে। আমি শুভমদাকে বলতেই শুভমদা দৌড়ে গিয়ে কাকটিকে বের করে নিয়ে এল। ঘুড়ির সুতো কাকটার পাখায় এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে উড়বার ক্ষমতা নেই। শুভমদা ধীরে ধীরে প্যাঁচ লাগা সুতো খুলে দিয়ে কাকটাকে প্রাচীরে বসিয়ে দিল। একটুখানি বসে থেকে কাকটা উড়ে চলে গেল। সুতোর প্যাঁচ খোলার সময় কাকটা ঝটফট করেনি। মনে হয় বুঝতে পেরেছিল ওকে বাঁচানো হচ্ছে।

তুষার রজক, ষষ্ঠশ্রেণী, বারাণসী ঘোষ লেন, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) শ ণ গ্র প থ	(১) ম হা য়া র নি মো
(২) পা ন ন ল ল	(২) ল অ বি ট রী হা

২৭ আগস্ট সংখ্যার উত্তর
(১) বিজয়তোরণ (২) ভাসুরঠাকুর

২৭ আগস্ট সংখ্যার উত্তর
(১) স্বয়ংসেবক (২) ক্ষমাপরায়ণ

উত্তরদাতার নাম
(১) রূপষা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৪৯। (২) স্নেহা বিশ্বাস, গাজোল, মালদহ। (৩) অরিত্র নন্দ, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর। (৪) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ২৫

কর্ণ, দ্রোণ প্রমুখ পরাজিত যোদ্ধা লক্ষ্মণের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

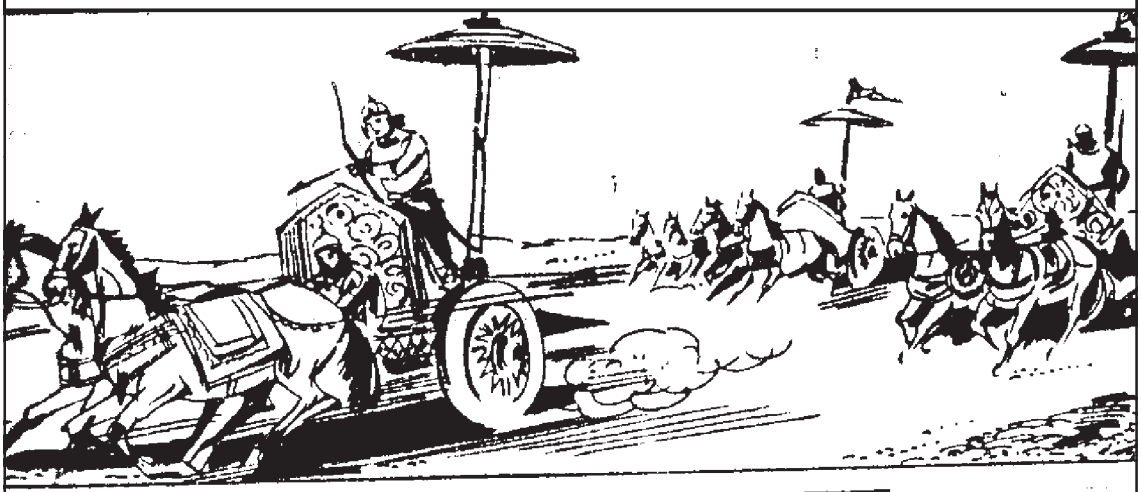

কিন্তু তীব্র বেগে অভিমন্যুর একটি তির ছুটে আসে।

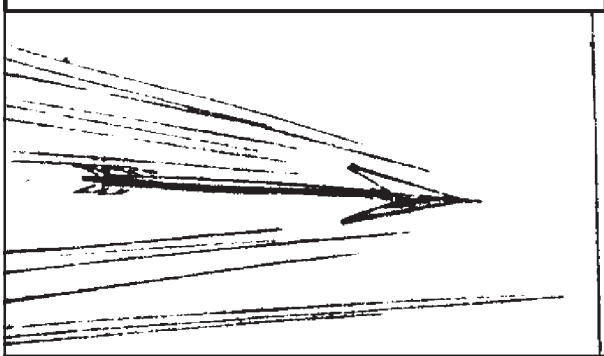

এবং লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করে।

ছেলের মৃত্যুতে দুর্যোধন ক্ষিপ্ত হয়।

তারকাদের চোখে এশিয়াডে এই ফল অপ্রত্যাশিত

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক সময় সকাল দেখে বোঝা যায় না সারাটা দিন কেমন যাবে। পরিবেশ ও আবহাওয়া যেমন ঘনঘন পাল্টে যায় এই জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে, ঠিক তেমনই বোঝা যায়নি এবারের এশিয়াডে ভারতের এই অবিমিশ্র ফলাফল অন্তত কমনওয়েলথ গেমসের প্রেক্ষিতে। কমনওয়েলথ গেমসে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজিরিয়ার চ্যালেঞ্জ সামলে যে পারফরমেন্স মেলে ধরেছিল ভারতীয় অ্যাথলেটিরা, তার পুনরাবৃত্তি হলো না, চিন, কোরিয়া, জাপানের সামনে পড়ে। এমনটাই অভিমত টিভি চ্যানেলে বিশেষজ্ঞের মতামত দিতে বসা তিন প্রাক্তন তারকার। এই প্রতিবেদনে তাদের প্রতিক্রিয়া সংক্ষিপ্ত পরিসরে তুলে দেওয়া হলো, যার ব্যাখ্যা অনেক গভীরে প্রবিষ্ট।

জগবীর সিংহ (প্রাক্তন আন্তর্জাতিক হকি তারকা) : এশিয়াডে ভারতীয় হকি টিম নিজেদের সুনাম অনুযায়ী খেলেছে। এই প্রতিবেদন তৈরির সময়ে ভারতীয় দল গ্রুপ পর্যায়ের সব ম্যাচে সহজ জয় তুলে নিয়েছে সব প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। যে দলটি এই এশিয়াডে খেলছে তা চ্যাম্পিয়নস ট্রফির মতো বিশ্বমানের টুর্নামেন্টে রানার্স হয়েছে। এই টিমের পক্ষে এশিয়াডে চ্যাম্পিয়ন হওয়াই স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে শুটিংয়ে আরো বেশি পদক আশা করেছিলাম। অন্যদিকে ওয়েটলিফটিং, কুস্তি, বক্সিং, টেনিস এইসব খেলায় কমনওয়েলথ গেমসে যে গরিমা মেলে ধরেছে, তার ছিটেফোটাও দেখা যায়নি এশিয়াডে। আসলে আমার মনে হয় চিন, কোরিয়ার জুজু মনের মধ্যে ঢুকে বসেছিল ভারতীয়দের। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় চিনকে দেখলেই কেমন যেন মিইয়ে যায় ভারতীয়রা। আমার মতে এ ধরনের মাল্টি ডিসিপ্লিন ইভেন্টে সাফল্য পেতে গেলে শুধু বাহ্যিক দক্ষতা থাকলেই হয় না, তার সঙ্গে দরকার মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সতেজ ও শক্তিশালী থাকা। তাই মেন্টাল ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং নিয়ে বড় বড় মিটে যাওয়া উচিত। এই ঘাটতিটুকু পূরণ হলেই ভারত বড় পাওয়ার হাউস হয়ে উঠবে।

অপর্ণা পোপত (প্রাক্তন ব্যাডমিন্টন তারকা) : এশিয়ান গেমসে ব্যাডমিন্টন ভারতে খালি হাতে ফেরেনি। পিভি সিন্ধু ব্যক্তিগত বিভাগে রূপাজয়ী, সাইনা নেওয়াল ব্রোঞ্জ জিতেছে। এই ঘটনা আগে ঘটেনি। অনেক বছর আগে সৈয়দ মোদী ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের সবকটি বড় আসরে ফাইনাল খেলেছে সিন্ধু কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে চ্যাম্পিয়নের মুকুট মাথায় উঠছে না। সাইনাও মাঝেমধ্যে সেমিফাইনাল খেলে নিচ্ছে। তবে পুরুষেরা চূড়ান্ত ব্যর্থ। আমি কিদাম্বি শ্রীকান্ত ও এইচ এস প্রণয়ের কাছ থেকে আরো ভাল পারফরম্যান্স আশা করেছিলাম। এই দুজন গত বছরের ধারাবাহিকতা দেখাতে পারছে না। আমার মনে সিন্ধুর ফাইনাল হার্ডল আর শ্রীকান্ত, প্রণয়ের আন্তর্জাতিক মঞ্চে হঠাৎ পদস্খলনের প্রেক্ষিত খুঁজে বের করে তার সমাধানে সচেষ্ট হওয়া উচিত। যে কবাডিতে একটানা প্রায় তিরিশ বছর এশিয়াডে রাজত্ব করেছে ভারত, সেই খেলায় ইরানের কাছে পুরুষ ও মহিলাদের পরাজয় মন থেকে মেনে নেওয়া যায় না। গত এশিয়াডেই বোঝা গেছিল ইরান দারুণভাবে উঠে আসছে ভারতের চ্যালেঞ্জার হিসেবে। এখনই সতর্ক হয়ে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে না পারলে শুধু ইরান কেন, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়াও আগামী দিনে ভারতের পক্ষের কাঁটা হয়ে উঠবে। ভয় হয় হকির মতো কবাডিও না ভারতের দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায় অদূর ভবিষ্যতে।

সোমদেব দেব বর্মন (প্রাক্তন ডেভিস কাপার) : আমার রেকর্ডটি রামনাথন রামকুমার স্পর্শ করতে পারল না। গভীর বেদনাদায়ক অনুভূতি। ২০১০ এশিয়াডে সিঙ্গলস, ডাবলস মিলিয়ে জোড়া সোনা জিতেছিলাম। ভেবেছিলাম রামনাথন সিঙ্গলস জিতবে আর বোপান্না, শরণ জুটি ডাবলসে বাজিমাত করবে। বোপান্নারা ভারতেকে গর্বিত করেছে কিন্তু রামনাথন প্রথম রাউণ্ডেই বিদায় নিয়ে নিজের প্রতিভার প্রতি সুবিচার করতে পারেনি। রাম যথেষ্ট প্রতিভাবান, মাঝে মধ্যে এটিপি সার্কিটে দৈত্য সংহারক হয়ে ওঠে কিন্তু লম্বা রেসের ঘোড়া হয়ে উঠতে পারে না। ওর আগ্রাসী মানসিকতার অভাব। লড়াকু ও আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে কোর্টে নামতে হবে। তবে আশার কথা এই ৩৭/৩৮ বছর বয়সেও বোপান্নার স্পিরিট অক্ষুণ্ণ রেখে পরপর ম্যাচ খেলে যাওয়া এবং জুনিয়র পার্টনারকে নিয়ে ঠিকমতো চালনা করে বিজয় মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ানো।

সোমা বিশ্বাস (প্রাক্তন জয়ী অ্যাথলিট) : হকি, কবাডির ব্যর্থতা অনেকটাই পুষিয়ে দিয়েছে অ্যাথলেটিক্স। ১৯৫১-র এশিয়াডের পর এবারই ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ড থেকে এতগুলো পদক এসেছে। হিমা এবং স্বপ্না দুই বঙ্গ তনয়া যা করে দেখিয়েছে তার জন্য বাংলা ও অসমের সব শ্রেণীর মানুষের গর্ব হওয়া উচিত। মহিলা রিলে দল (৪×১০০) ২০০২ থেকে এশিয়াডে অপরাজেয়। এই ঘটনাও ভারতের অ্যাথলেটিক্সের ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী অধ্যায় রচনা করেছে। তেজিন্দার, নীরজ চোপড়া থ্রোয়িং ইভেন্টে দৈত্য সম অবয়ব তৈরি করেছে। ট্রাক ও ফিল্ডের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে পারফরমেন্স মেলে ধরেছে ভারতীয়রা, তা বহু বছর মনে রাখবে দেশবাসী।

হিন্দু-চোরের কথা এক অনিবার্য সত্য ভাষণ

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

বাংলাদেশের হিন্দুরা আসলে চোরের জীবন যাপন করে। ওরা মালাউন, কাফের, মুশরিক বা বড় জোর জিম্মি। কথা চালু আছে 'হয় আওয়ামি লিগের বাঁধা ভোটার, নয়তো অত্যাচারিত হবার জন্য তৈরি থাকো।' প্রতিবছরই টাঙ্গী নামক বিশাল ময়দানের জমায়েত হয়। এটা নাকি পৃথিবীর সব থেকে বড়ো ধর্মীয় জমায়েত। অজস্র হিন্দু আর অন্য সংখ্যালঘু মানুষ নরনারী নির্বিশেষে 'স্বেচ্ছায়' ইসলাম কবুল করছে! এই খবর লক্ষ করতালিতে মুখর ময়দানের জনতাকে অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল করে। এসব মানুষ স্বেচ্ছাকৃতভাবে ধর্মত্যাগ করে না।

তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' পড়ুন, দেখবেন কী অসম্ভব অত্যাচার সহ্য করে সংখ্যালঘুর দল, এসব কথা লেখার জন্যই তসলিমা বেঘর মুরতাদ মুশারিক মুনাফেক হয়েছেন। দু'তিনটি অনুরূপ লেখার সংবাদ জানি। সালাম আজাদ লিখেছেন : 'ভাঙা মঠ'। হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন : '১০,০০০ এবং একটি' আর 'পাক সার জমিন সাদা বাদ'। সালাম আজাদের বই পশ্চিমবঙ্গে লেখা ও ছাপা। হুমায়ুন আজাদ তাঁর সাহসী সাহিত্য কর্মের ফল পেয়েছেন। উপর্যুপরি ছুরিকাহত হয়ে জার্মানির হাসপাতালে চিকিৎসা হবার ফাঁকে রহস্যজনক মৃত্যু হয় তাঁর। এই সব লেখার একটা সাধারণ লক্ষণ এগুলি যুক্তিবাদী, মানবিক ভাবে সংখ্যালঘুদের সমস্যার উৎসের দিকে দৃষ্টি ফেলেছে।

নোয়াখালির ভয়ঙ্কর একতরফা হিন্দু নিধন নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন সেলিনা হোসেন : 'সোনালি ডুমুর'। এ বই ভারতে প্রকাশিত। আর এর পরিণতি বাংলাদেশের বিচিত্র প্রগতিশীলতার প্রস্তাবে। এত কথা মনে এল 'সরস্বতী কলামন্দির'-এর নাটক প্রবীর মণ্ডল অভিনীত পরিচালিত 'হিন্দু-চোর' বা 'গিরেন চোর' দেখার পর। আগে এই নাটক কয়েকবারই অভিনীত হয়েছে : কেউ কোনো আপত্তি করেনি! 'হিন্দু চোর' নিয়ে কেউ কিছু বলেনি। উপেক্ষা করেছে? এমনও হতে পারে। আমাদের সংস্কৃতি বুদ্ধিজীবিতা একান্তভাবেই বামপন্থীদের খোলা ময়দান। তারাই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তারাই দলবদ্ধভাবে সংস্কৃতি জগৎকে শাসন করে। মাছিও ঢুকতে পারে না। এমন ব্যবস্থা!

টাকির সানি কীভাবে যে ঢুকে পড়লেন! 'নান্দীকার'-এ অভিনয় শিখে, রমাপ্রসাদ বণিকের চোখে পড়েছিলেন মফস্‌লের প্রবীর মণ্ডল। এতদূর যাহোক হচ্ছিল কিন্তু এ কী! প্রবীর যে সাতক্ষীরার ফেলে আসা স্মৃতি নিয়ে নিজে লিখলেন নাটক! সহ্য হয়! সেখানে আবার মুসলমান বিদ্বেষ— অত্যাচারিত হিন্দুর সর্বহারা প্রান্তিক মানুষের চোরের মতো বেঁচে থাকার বাধ্যতা! সুতরাং ওকে আটকাও। 'শিশির মঞ্চ' অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু পুলিশবার্তা ফোন করে বললেন করা যাবে না ওই নাটক! এতো তালিবানি কাণ্ড! ইরান ইরাক সিরিয়ায় হয়, নাট্য আন্দোলনের মক্কা কলকাতায় কেন হবে? উত্তর নেই।

৩০ জুলাই আই সি সি আর মঞ্চে কোনোক্রমে নাটকটি মঞ্চস্থ হলো। সভাগৃহে দর্শক উল্লেখযোগ্যরকম ভাবে কম। এর কারণ নানারকম অপ্রকাশ্য বাধা। আলাকসম্পাত করার কথা যার, শেষ মুহূর্তে ডুব দিয়েছেন। প্রবীরের সাহস আছে আর আছে তার বন্ধুদের আন্তরিকতা। অসাধ্যসাধন করলেন তারা।

নাটক একক অভিনয়। দু' ঘণ্টা দর্শকদের ধরে রাখা কঠিন। মনের জোর, শিল্পীর অভিমান আর লড়াকু মানসিকতা না থাকলে এমন উপস্থাপনা অসম্ভব।

গিরেন এক বিচিত্র চোর। সাতক্ষীরা জেলায় সবাই চেনে। হিন্দু মুসলমান সবাই তাকে আলাদা চোখে দেখে। চুরি করলেও সে কিছুটা রবিনহুড ঘরানার অপরাধী। হিন্দু-মুসলমান সবাই কষ্টে পড়লে গিয়ে ধরে। গিরেন চুরি করে তাদের বিলিয়ে দেয় সব! 'ইন্ডিয়া'-তে চিকিৎসা করতে আসা বহু মানুষ তার দ্বারা উপকৃত।

কিন্তু তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে গেল পুত্রকে নিয়ে— রেখে গেল চিরকুট : ইন্ডিয়ায় যাচ্ছি। অপমানের জীবন আর ভালো লাগছে না। ছেলেটাকে মানুষ করার ইচ্ছা।

আর আছে একজন হাজি। মাঝে মধ্যে কথা বলেন। যুক্তিবাদী মানুষ, বিবেচক। গিরেন বলে : এই বাংলাদেশটা কি আমাদের দেশ নয়? তাহলে কোথায় আমার দেশ?

উত্তর আসে : কথাটি ঠিক। পাকিস্তান হবার সময় আমরা আমাদের দেশ চেয়েছি। তোমরা তো চাও নাই! আর ইন্ডিয়া তো ধর্মনিরপেক্ষ মানে সবারই সমান অধিকার। ঠিকই, হিন্দুদের এই পৃথিবীতে কোনো দেশ নাই।

সমস্যা যখন ঘনিয়ে আসে, তীব্র বেদনায় মুহ্যমান হিন্দুচোরকে হাজি সাহেব বলেন তুমি মুসলমান হও। তোমাকে আমি প্রতিষ্ঠিত করব! গিরেন তো সুমন নয়, লোভ আর প্রতিপত্তির ভিক্ষুক! কবীর হয়ে গিটকিরি দেবেন! ফলে ও চলে এল। এমন এক দেশে যেখানে তার সম্মান নেই ভালোবাসা নেই অস্তিত্ব নেই! ছেড়ে এল একটি তুলসীমঞ্চ উঠোন মায়ের স্মৃতি কণিকা। চোরের মত? হয়তো তাই। শুধু বাংলাদেশি নয় জিহাদিদের তোষণকারী ব্যবস্থা যে এখানেও। জীবন তাকে শেখায় হিন্দু যেহেতু নির্বিরোধ পরমতসহিষ্ণু, তাই এ বিপুল বিশ্বে তাকে চোরের মতোই থাকতে হবে। তাড়া খাওয়া পথের কুকুর বা ঝড়ের ডানা পাখির চেয়ে অসহায়! এই তার ভবিতব্য! নাটক জীবন দেখায়। পালটাতে পারে না। ওপার বাংলা এপার বাংলার রঙিন ফানুস ভিড়ে প্রবীর মণ্ডলের 'হিন্দু চোর' সত্যটাকে অবিকল তুলে ধরে।

অভিনয় মঞ্চ পরিকল্পনা নানা চরিত্র উপস্থাপনার ভঙ্গি সুন্দর। আমি এই নাটকের প্রচার কামনা করছি। ▮

খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের কাণ্ডকারখানা একটি বিপজ্জনক ধারা

পুলকনারায়ণ ধর

ভারতবর্ষে ধর্মকে সামনে রেখে ইংরেজ ও ইসলাম উপনিবেশবাদের যুগ থেকেই এক নেতিবাচক যজ্ঞ চলেছে। ইংরেজ চলে গেছে তার বিপুল কুসংস্কৃতির বোঝা ভারতবাসী বিশেষ করে হিন্দু বাঙালির ওপর চাপিয়ে দিয়ে। আর মুসলমানরা ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দেশটাকে ভাগ করে পাকিস্তান করেছে। এর পরও ভারতের অভ্যন্তরেই পাকিস্তানে যত মুসলমান আছে তারও অধিক সংখ্যক মুসলমানদের বাসভূমি করে সেই পাকিস্তানি রাজনীতিরই চর্চা করে চলেছে। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম দুই-ই আন্তর্জাতিক মাত্রা বিশিষ্ট। ইদানীং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও একটি 'মুসলমানি' মডেল আমদানি হয়েছে। মুসলমানদের মতন তারাও বলতে শুরু করেছে ভারতে খ্রিস্টান সংখ্যালঘুরা খুবই বিপন্ন। কারণ বর্তমানে এদেশে গণতন্ত্র নেই। মুসলমান জনগোষ্ঠীর মতন তারাও রাজনীতি নিরপেক্ষ না থেকে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিতে খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের ভোটারদের উত্তেজিত করছে। খ্রিস্টান মিশনারিরা এ নিয়ে সম্প্রতি সোরগোল তুলেছে। দুনিয়ার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এক মঞ্চে জড়ো করে একটি রাজনৈতিক উপদ্রবের সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য। এর মাধ্যমে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যেও একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি তথা মোদী বিরোধী একটি গেল গেল রব তোলা হচ্ছে। সামনে ভারতীয় সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষার অভিনয়। দিল্লির এক খ্রিস্টান পুরোহিত আর্চবিশপ অনিল কোঠারি বলেছেন ভারতে সংখ্যালঘুরা আদৌ নিরাপদ বোধ করেন না। অসহিষ্ণুতা ও সংখ্যাগুরুর দাপটে ভারতে সংখ্যালঘুরা বিপন্ন। গোয়ার আর্চবিশপ আবার ভারতের বহুত্ববাদী সংস্কৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন একক-সংস্কৃতির আধিপত্য ভারতীয় সংস্কৃতিকে তছনচ করে দিচ্ছে। সুতরাং এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান দল বিজেপির বিরুদ্ধে সকল খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীকে ভোট দিতে আহ্বান করেছেন।

আপাত শান্ত নিরীহ এই খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে হঠাৎ রাজনৈতিক কাণ্ডকারখানায় অবতীর্ণ হতে দেখে একটু আশ্চর্য হতে হয়। এই ধরনের বক্তব্য ও ভোটের ফতোয়া ইসলামি মোল্লা ও মোয়াজ্জেনরাই সাধারণত পেশ করে থাকে। মুসলমান সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক হুঙ্কার নতুন কিছু নয়। কিন্তু খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে মুসলমান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ধর্মবন্ধনে উৎসাহিত করে দুই আর্চবিশপ রাজনৈতিক বিবাদে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। কেরল ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অংশেই খ্রিস্টান যাজকরা ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় আধিপত্য করেন। এদের ভোটের সংখ্যা এই সব অঞ্চলে আঞ্চলিক প্রভাব ফেললেও সারা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নগণ্য। এটা খুবই বিস্ময়ের যে মুসলিম ও খ্রিস্টানরা ভারতের 'সেকুলার' মূর্তি নিয়ে বড়ই চিন্তিত। এদের ধর্মের গঠন ও কার্যাবলীর সঙ্গে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র কোনো সামঞ্জস্য নেই। এই উভয় ধর্মই অন্য ধর্মকে আমল দেয় না। উভয় সম্প্রদায়ই নিজেদের ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করে এবং ধর্মান্তরকরণে শুধু বিশ্বাসই করে না, প্রতিনিয়ত সে প্রয়াসও চালিয়ে যায়। ইদানীং এই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস কোনও কোনও জায়গায় প্রতিহত হচ্ছে। এতেই এরা প্রমাদ গুণছে। অন্য ধর্মের মানুষদের বা বিশ্বাসীদের এরা তাদের ভাবনায় স্থির থাকতে দেবে না। অসহিষ্ণুতা এদের মজ্জাগত। সংখ্যাগুরু হিন্দু, সংখ্যালঘু মুসলমান, খ্রিস্টান কেউই ভারতের সংবিধানের বাইরে অবস্থান করতে পারে না। এ বিষয়ে ভারতের সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারা থেকে ২৮ নম্বর ধারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে বলছে : সংখ্যালঘুদের অবশ্যই কিছু অধিকার আছে তবে তা "Subject to public order morality and health...all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to progress practise and propagate religion." রাষ্ট্র কোনও ধর্মের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। কারও ধর্মাচারণ বাধা দেয় না। কিন্তু বলপূর্বক বা তঞ্চকতার মাধ্যমে অন্য কোনও ধর্মের ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করাও যাবে না। খ্রিস্টান যাজকরা কি বলবেন যে এসব দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে? দুই মহান খ্রিস্টীয় যাজক বলেননি ভারতের সংবিধানের কোন অংশটি বা ধারা লঙ্ঘিত হচ্ছে। বস্তুত যদি তা হয়ে থাকে তবে বিচার বিভাগের দ্বারস্থ হতে তাদের কে বাধা দিয়েছে? যা পাকিস্তানে ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে ঘটে থাকে তা ভারতে হয় না। চিরকালই ভারত সকল ধর্মের মানুষকে স্থান দিয়েছে। ভারত ধর্মীয়-সংখ্যালঘুদের কাছে সবচেয়ে নিরাপদ দেশ একথা যারা সোরগোল তুলছেন তারা ভালোভাবেই জানেন। তারা বিনা প্রতিরোধে নিজধর্ম প্রচার করে গেছেন। ভারতবর্ষে আজ যে বিরাট খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বর্তমান তার জন্য ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক সহিষ্ণুতা এর মূলে সে সত্য যাজকরা ভুলে গেছেন। তারা আজ বাইরের প্ররোচনায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে একটি সরকারকে সমালোচনা করার নামে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিকে এক মঞ্চে জড়ো করার দায় গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক জিগির তোলার চেষ্টা করছে। যাজকদ্বয় জল তল পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে ময়দানে আবির্ভূত হয়েই আবার মিলিয়ে গেলেন। এই পর্বটি আপাতত শান্ত হলেও সমাপ্ত হয়নি। এদের ভাবটা এই যে ইসলাম ধর্ম যদি প্রসার লাভ করতে পারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাহলে খ্রিস্টান ধর্মই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? এই প্রচেষ্টা তো তারা ভারতে ইসলামের আগমনের বহু যুগ পূর্বেই শুরু করেছিল।

খ্রিস্টানরা সংখ্যায় ভারতে খুব কম হলেও তারা আদৌ শান্ত নিষ্পাপ নন, এই ধারণা সাধারণ হিন্দুরা যদি পোষণ করে থাকে তার জন্য অবশ্যই দায়ী খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ।

খ্রিস্টের জন্মের ৫২ বছর পরেই কেরলের টমাস খ্রিস্টরা এসেছিল। প্রায় ৪০০ খ্রিস্টিয় পরিবার কেরলে এসেছিল। এরা স্থানীয় হিন্দু

ফঃ ৬

সংস্কৃতি ও ভাবধারার সঙ্গে মিশে যায়। পরবর্তীকালে পতুর্গীজ খ্রিস্টানরা যারা ছিল ক্যাথলিক ও গোঁড়া তারা ভারতের নানা জায়গায় বিশেষত গোয়ায় অধিষ্ঠিত খ্রিস্টানদের ওপর ইউরোপীয় ভাব ও আচার আচরণ জোর করে চাপায়। খ্রিস্টানদের নানা বর্ণ ও গোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে গোষ্ঠীগত ও 'জাতিগত' দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। ঊনবিংশ শতকে ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে ভারতে যে ৩ কোটি খ্রিস্টান বসবাস করে। এই ৩ কোটির মধ্যে প্রায় ৮৫ লক্ষ উত্তর-পূর্ব ভারতে বসবাস করে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে, মধ্যপ্রদেশে, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ও উত্তর ভারতে খ্রিস্টান মিশনারিগণ ধর্ম প্রচার করে বহু মানুষকে ধর্মান্তরিত করেন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অরুণাচল খ্রিস্টানদের নাগালের বাইরে ছিল। কিন্তু বর্তমানে অরুণাচলের জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগেরও অধিক খ্রিস্টান। ১৯৪৭ সালে নাগাভূমিতে জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ ছিল খ্রিস্টান। আজ ৮৭ ভাগ হচ্ছে খ্রিস্টান। কে এই জনবিন্যাসের ধারা রূপান্তরিত করেছে? খ্রিস্টান মিশনারিরা নয় কি? হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে খ্রিস্টানদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আজ বেশি। মুসলমানদের পরেই এদের হার বৃদ্ধি। সংখ্যালঘু হিসাবে এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এটা কি হিন্দু সমাজের অসহিষ্ণুতার চিহ্ন। সরকার আজ আছে কাল নেই। তার স্থায়িত্ব সর্বদাই প্রশ্ন চিহ্নের মুখেই থাকে। কিন্তু সমাজ সাময়িক নয়। সহিষ্ণুতা বা অসহিষ্ণুতা সমাজের মানুষের চরিত্রেই বিরাজ করে। খ্রিস্টান মিশনারিদের কার্যকলাপ সরকার সহ্য করলেও সমাজের মূলধারার মানুষ বা হিন্দুসমাজ যদি তা কখনও আপত্তিজনক মনে করে তবে সরকারের কিছুই করার থাকে না।

ধর্মান্তরণের ফলে একই পরিবারে একজন খ্রিস্টান ও অন্যরা হিন্দু বা অখ্রিস্টান এমন ঘটনাও ঘটে। এর ফলে পারিবারিক তথা সামাজিক ভারসাম্যের ক্ষতি হয়। পরিবারের মধ্যে সূচিত হয় নানা বিবাদ বিসম্বাদ। এই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে ছিল ওড়িশার কেন্দুঝাড় অঞ্চলে। গ্রাহাম স্টেইনস নামক একজন মিশনারি প্রচারক ও তার দুই নিষ্পাপ শিশু সমেত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার গাড়ি (২৩ জানুয়ারি ১৯৯৯)। এই ঘটনা শুধু বাহ্যিক ভাবে নিন্দা করলেই দায় সমাপ্ত হয় না। এর গভীর সামাজিক কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। খ্রিস্টান প্রচারকদেরও ভাবতে হবে তাদের কার্যক্রম বিষয়ে। সম্প্রতি রাঁচির একটি মিশনারি আবাস থেকে শিশু বিক্রির অবৈধ কাজ কারবারের অভিযোগ উঠেছে। মিশনের সঙ্গে যুক্ত ধৃত ব্যক্তিরা তা স্বীকার করেছে। সংস্থাটি তালাবন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এসব ঘটনা হয়তো হিমশৈলের সামান্য দৃশ্যমান চূড়া মাত্র। মিশনারিদের এইসব কাজকর্ম ও ধর্মান্তরণ কর্মসূচি ক্রমশ জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। এই কারণে যেখানে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা হয় সেসব স্থানে প্রতিরোধের ঘটনা ঘটছে। এটা আগে ছিল বিরল প্রতিক্রিয়া। কিন্তু দেশের বৃহত্তর ধর্মীয় অংশ যদি আজ নিজেকে সংখ্যালঘুত্বের রাজনীতি দ্বারা বিপন্ন বোধ করে তবে এই ধারা অব্যাহত থাকবে। আজ সে নিজেকে রক্ষাকল্পে যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয় ওঠে সে দায় সরকারের নয়। খ্রিস্টান মিশনারিরা সংবিধানের সীমা অতিক্রম করেও তাদের কর্মসূচি রূপায়ণের চেষ্টা করে।

এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। স্টেইনিসলাউস (stainislaus) মামলায় (১৯৭৭) সুপ্রিমকোর্ট এক রায়ে বলেছিল যে, যে-কোনও প্রকারে ধর্মান্তরিত করা সংবিধান বিরোধী। মধ্যপ্রদেশ সরকারের একটি আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে খ্রিস্টান যাজক দাবি করলেন যে খ্রিস্টানরা যে ভাবে উপযুক্ত মনে করে সেই ভাবেই ধর্মান্তরকরণ করতে পারে। কিন্তু লোভ ও প্ররোচনামূলক বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ওড়িশা সরকারও এই ধরনের একটি আইন রচনা করেছিল। যদি দেখা যায় যে ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে ধর্মান্তরকরণকে কেন্দ্র করে জনঅসন্তোষ বা আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হচ্ছে সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অবশ্যই বৃহত্তর স্বার্থে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে। (Public order, morality or health)। কোনও কার্যক্রমই নাগরিকদের 'বিবেকের স্বাধীনতা' বা freedom of conscience এর-বিরুদ্ধে চলতে পারে না। খ্রিস্টান মিশনারিরা ধর্মান্তরকরণের জন্য হাজার হাজার সংস্থা তৈরি করেছে। এই সংস্থাগুলির অনেকেই আজ সরকারের তীক্ষ্ণ নজরে পড়ে তাদের বেআইনি সংবিধান বিরোধী কাজকর্ম বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। খ্রিস্টীয় উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হতে হয়েছিলেন ওড়িশার ৮৩ বছরের প্রধান সন্ন্যাসী লক্ষ্মণানন্দকে ২০০৮ সালে। স্বামী লক্ষ্মণানন্দ উপজাতি সম্প্রদায়ের ধর্মান্তরকরণ রোধ করার কাজ করছিলেন। ২০০৪ সালের ১১ নভেম্বর কালীপূজার রাত্রে কাঞ্চীকামকোটির জগদ্‌গুরু স্বামী জয়েন্দ্র সরস্বরতীকে তামিলনাড়ুর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার সঙ্গে চক্রান্ত করে সোনিয়া গান্ধী গ্রেপ্তার করে কারাগারে বন্দি করেন। তৎকালীন কেবিনেট মন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় সে সময় এই ঘটনার তীব্র আপত্তি ও নিন্দা করে সোনিয়া গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি কি কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আগের মুহূর্তে কোনও মুসলমান ধর্মীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন? এটা কোনও সেকুলারিজমের পরিচয় নয়।" সুতরাং খ্রিস্টানরা সংখ্যায় ভারতে খুব কম হলেও তারা আদৌ শান্ত নিষ্পাপ নন, এই ধারণা সাধারণ হিন্দুরা যদি পোষণ করে থাকে তার জন্য অবশ্যই দায়ী খ্রিস্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানকে রক্ষা করার উদ্যোগ নিয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষাকবচের আড়ালে সংবিধানিক আইন লঙ্ঘন করার প্রয়াস বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। সুতরাং দেশজ প্রচারকগণই নন খোদ 'ভ্যাটিকানের' কর্তাদেরও কপালে ভাঁজ পড়েছে।

ইদানীং নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে উঠে এসেছে সংখ্যালঘু ধর্মীয় তাস। এই অঙ্কে মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর খ্রিস্টান প্রীতিও একটু বাড়াবাড়ি রকম দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি দিল্লি গিয়ে তিনি খ্রিস্টান যাজকদের বিজেপি বিরোধিতার রাজনীতিকে সাধুবাদ জানিয়ে এসেছেন। যীশুখ্রিস্ট প্রেমের দেবতা। কিন্তু এরা ভোটের লাগি চাহে প্রেম...। সুতরাং সৃষ্টি হয় সংঘর্ষ ও ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ। আবার এই দেশের সর্ব প্রাচীন কংগ্রেস দলের শীর্ষে আছেন একজন রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান যিনি একই সঙ্গে ভ্যাটিকানের আজ্ঞাধীন ও ভারত ইতালির যৌথ নাগরিক। এই কারণেই তিনি খ্রিস্টান যাজকদ্বয়ের অভিযোগের ক্ষেত্রে চরম নীরবতার সাধনা করে চলেছেন। নিজ পুত্রকে গলায় পৈতে চড়িয়ে মন্দিরে মন্দিরে পাঠাচ্ছেন। খ্রিস্টান যাজক ও তাদের সন্তানরা কি জানেন না যে চেনা বামুনের পৈতে লাগে না? ■

পরলোকে প্রবীণ প্রচারক হরিপদ সাহা

গত ২৬ আগস্ট ভোর ৪টে ৪৫ মিনিটে লোকান্তরিত হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক হরিপদ সাহা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। রেখে গেছেন ছোটো ভাইয়ের পরিবার-পরিজন ও অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধবকে। তাঁর জন্ম অবিভক্ত বঙ্গের ঢাকায়। দেশভাগের পর তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাটে এসে বসবাস শুরু করেন। পরে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি নিয়ে তিনি আসানসোলে আসেন এবং সেখানেই স্বয়ংসেবক হন। চাকরি জীবনে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। অবসর গ্রহণের পর সঙ্ঘের প্রচারক জীবনের ব্রত গ্রহণ করেন। কয়েক বছর ভারতীয় জনতা পার্টির দায়িত্ব পালন করেছেন। পরে সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যালয় কেশব ভবনে ভোজন বিভাগ ও স্বাগত বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। বেশ কয়েক বছর যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন। মত্যুর কয়েকদিন আগে তাঁকে কলকাতার মাড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। গত ৩০ আগস্ট সন্ধ্যায় কলকাতার নিবেদিতা সেবাকেন্দ্রে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়, প্রবীণ প্রচারক প্রদীপ দে, রঞ্জনকান্তি ভুঁইয়া, সংস্কৃতভারতীর প্রণব নন্দ প্রমুখ তাঁর স্মৃতিচারণ করেন। উপস্থিত সকলেই তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

শোক সংবাদ

গত ২৭ আগস্ট কোচবিহার জেলার ডাওয়াগুড়ি খালপাড়া শাখার স্বয়ংসেবক দিলীপ মল্লিকের মাতৃদেবী নিরদা মল্লিক পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হযেছিল ৭৯ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ৩ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমা কার্যবাহ তাপস রায়ের ঠাকুমা নারায়ণী রায় গত ৪ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

মেদিনীপুর নগরের সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী শিবসাধন দাস গত ১৯ আগস্ট বাঁকুড়া শহরে তাঁর কন্যার বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৪ কন্যা, ৪ জামাতা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি বাঁকুড়া জেলার পূর্বতন জেলা সঙ্ঘচালক ডাঃ সুভাষ সরকারের শ্বশুরমশাই। ডাঃ সরকারই পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মেদিনীপুর নগর সঙ্ঘচালক মৃগাঙ্কশেখর মাইতির সহধর্মিণী গীতা মাইতি গত ২৪ আগস্ট

পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্বামী, ১ পুত্র, পুত্রবধূ, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তাম্রলিপ্ত জেলার কাঁথি নগরের স্বয়ংসেবক হরিনাথ নন্দের পিতৃদেব পরেশ চন্দ্র নন্দ গত ২১

আগস্ট নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, কাঁথি কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক গঠনের তিনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। পরোপকারী, সদালাপী ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি সুপরিচিত ছিলেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র পঞ্চতীর্থ বেদান্ত বিদ্যার্ণব বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের তিনি পুত্র।

ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ অবস্থানে পুলিশের হামলা, গ্রেপ্তার ২৫

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এসসি, এসটি, ওবিসি ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণা ও গবেষক বৃত্তি প্রদান, নতুন হস্টেল, পুরাতন হস্টেলের পরিকাঠামো উন্নত করা ইত্যাদি দাবি নিয়ে কলকাতার সল্টলেকের করুণাময়ীতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে গত ৩০ আগস্ট ছাত্র-ছাত্রীদের শান্তিপূর্ণ ধরনায় বিধাননগর থানার পুলিশ নির্লজ্জভাবে হামলা চালায়।

সেদিন কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ধরনা প্রদর্শন শুরু হতেই

বিধাননগর থানার পুলিশ কার্যসূচি বানচাল করার চেষ্টা করে। হঠাৎই তারা অবস্থান ধর্মঘট বন্ধ করতে বলে ছাত্র-ছাত্রীদের টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে। শুরু হয়ে যায় ধস্তাধস্তি। তারপরেই বিদ্যার্থী পবিয়দের ২৫ জন কার্যকর্তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। সারাদিন থানায় বসিয়ে রেখে রাত্রিতে তাদের ছেড়ে দেয়। দু'জন ছাত্র খাবারের প্যাকেট নিয়ে আসছিল তাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়।

সেদিন সংবাদ প্রতিনিধির কাছে এবিভিপি-র রাজ্য সম্পাদক ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতারা হাজার হাজার টাকা তোলায় অভিযুক্ত হয়েছে, তাদের পুলিশ গ্রেপ্তার না করে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থের জন্য লড়াই করা বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন ভেস্তে দিয়ে গ্রেপ্তার করছে— এটা অত্যন্ত লজ্জার। কলকাতার ভারপ্রাপ্ত ছাত্রনেতা অরবিন্দ দত্ত বলেন, এটা পরিষ্কার যে, রাজ্য সরকারের অঙ্গুলি হেলনেই পুলিস এই নির্লজ্জ ব্যবহার করেছে। পুলিশের ব্যবহারে পরিষ্কার যে, মমতা সরকার রাজ্যের পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আন্দোলন সমর্থন করে না। রাজ্য সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, তাদের দাবিদাওয়া সরকার না মেনে নিলে আগামীদিনে তারা রাজ্য জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে।

নদীয়ার তাহেরপুরে কালীমন্দির অপবিত্র করল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গত ২২ আগস্ট বকর-ইদের পরদিন নদীয়া জেলার তাহেরপুর থানার গড়ুয়াপোতা গ্রামের কালীমন্দিরে জবাই করা গোরুর মাথা ফেলাকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। সেদিন ভোরবেলা গ্রামের কয়েকজন মহিলা দেখতে পান যে, কালীমন্দিরের বারন্দায় কে বা কারা কাটা গোরুর মাথা ফেলে দিয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা মন্দিরে ভিড় করেন। থানায় জানানো হয়। ডিআইজির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী, মহিলা পুলিস, র‍্যাফ, কমান্ডো উপস্থিত হয়। পুলিশ মাথাটি সরিয়ে নিতে চাইলে গ্রামবাসী দাবি জানায় আগে দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করতে হবে। পুলিশ তাদের কথায় কর্ণপাত না করে মহিলাদের মারধোর করে, পুরুষদের লাঠিপেটা করে মাথাটি নিয়ে, মন্দিরে রক্তের দাগ ধুয়ে দিয়ে চলে যায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ডিআইজি কথা দিয়েছিলেন যে, এক ঘণ্টার মধ্যে দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু এক সপ্তাহ কেটে গেলেও পুলিশ কোনও তৎপরতা দেখাচ্ছে না, বরং গ্রামের লোকেদেরই নানাভাবে হেনস্থা করা চলছে। জানা গেছে, পুলিশ প্রশাসনের এই ভূমিকায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও চালু ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু করলেন ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক (আইপিপিবি)। একই সঙ্গে দেশের আইপিপিবি-র ৬৫০টি শাখা এবং ৩২৫০টি অ্যাক্সেস পয়েন্ট চালু হয়ে গেল দেশে। পশ্চিমবঙ্গেও আইপিপিবি শুরু হয় গত ১ সেপ্টেম্বর কলকাতা, আসানসোল, বারাসাত, বর্ধমান, এবং শিলিগুড়িতে। পাশাপাশি আইপিপিবি-র ২১টি অতিরিক্ত শাখা এবং ১৩৫টি অ্যাক্সেস পয়েন্ট চালু হলো পশ্চিমবঙ্গে। কলকাতায় কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ আইপিপিবি-র আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। শিলিগুড়িতে করেন ওই মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী এস এস আলুহওয়ালিয়া, বর্ধমান ও আসানসোলে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহা সড়ক, জাহাজ, রসায়ন ও সার প্রতিমন্ত্রী মনসুখ মণ্ডাভিয়া এবং শিলিগুড়িতে কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। বারাসাতে আইপিপিবি-র সূচনা করেন রাজ্যসভার সাংসদ রূপা গাঙ্গুলি। কলকাতায় শ্রীপ্রসাদ বলেন, এটি এমন একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে। আইপিপিবি কাজ শুরু করলে ডাক বিভাগের রাজস্ব আদায় ও বিশ্বাসযোগ্যতা বহুলাংশে বেড়ে যাবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড পেরোল ছয় রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সরকার যদিও বহু ক্ষেত্রেই ডাক্তারের ঘাটতি থাকার কারণে নতুন নতুন প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ খোলার ছাড়পত্র দিচ্ছে, তবু দিল্লি, কর্ণাটক, কেরল, তামিলনাড়ু, পঞ্জাব ও গোয়ার মতো রাজ্যে জনসংখ্যা প্রতি ডাক্তারের অনুপাত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড ছাড়িয়ে গেছে বলে প্রকাশ। তবে হাজার মানুষ প্রতি একজন ডাক্তারের অনুপাত যতই মানদণ্ড ছাড়িয়ে যাক না কেন গ্রামীণ জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট চিকিৎসকের সংখ্যায় এখনও ঘাটতি রয়েছে। সমস্যা আরও একটি আছে— উল্লেখিত রাজ্যগুলিতে অতিরিক্ত চিকিৎসক থাকলেও তাঁরা কিন্তু বিহার বা উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্য যেখানে চিকিৎসকের চরম অভাব রয়েছে সেখানে যেতে অনিচ্ছুক। সংশ্লিষ্ট মহলে এ কারণেই প্রশ্ন উঠছে যে তাহলে ভুরি ভুরি ডাক্তার তৈরি করে লাভ কী হচ্ছে যদি প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় চিকিৎসা ব্যবস্থার হাল না বদলায়।

প্রসঙ্গত তামিলনাড়ুতে প্রতি ১০০০ জনে ডাক্তার সংখ্যা ৪ জন যা অতি উন্নত দেশ সুইডেন ও নরওয়ের হাজার প্রতি ৪.২ ও ৪.৩ এর সমকক্ষ। দিল্লির ক্ষেত্রে এটা ৩ যা অবাক হবার মতো আমেরিকা ব্রিটেন, কানাডা বা জাপানের ২.৩ থেকে ২.৮-এর মধ্যে থাকা অনুপাতের চেয়ে বেশি। কেরলে ও কর্ণাটকে অনুপাত ১.৫ ও গোয়া এবং পঞ্জাবে ১.৩ যা অবশ্যই মানদণ্ডের থেকে ওপরে। সূত্র অনুযায়ী ডাক্তারদের মোট সংখ্যা গুনতি করার আগে ২০ শতাংশ বাদ দেওয়া হয়েছে কেননা অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় মেডিক্যাল কাউন্সিলগুলি তাদের রেকর্ড আপ টু ডেট রাখে না। দিল্লির ক্ষেত্রে অবশ্য এর প্রয়োজন হয়নি।

ভারতে গ্রামাঞ্চলের পরিকাঠামোর তুলনামূলক পার্থক্যের কারণে ডাক্তারদের ঘনত্ব শহরাঞ্চলেই বেশি। তাই কোনও রাজ্যে সামগ্রিক ভাবে নির্ধারিত অনুপাতের চেয়ে বেশি ডাক্তার থাকলেও সেখানকার গ্রামাঞ্চল অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। এমনটাও সমীক্ষায় উঠে এসেছে। অবশ্য তামিলনাড়ু ও কেরল জানিয়েছে তাদের গ্রামীণ চিকিৎসা পরিষেবা ক্ষেত্রে চিকিৎসকের কোনও ঘাটতি নেই। কর্ণাটক মেডিকাল অ্যাসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব সভাপতি জানিয়েছেন সেখানকার ডাক্তারদের চল্লিশ শতাংশই ব্যাঙ্গালোর কেন্দ্রীক। এক জায়গায় প্রয়োজনাতিরিক্ত চিকিৎসক হয়ে গেলে রোজগার বাড়াতে ও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে অনেকেই সীমিত সংখ্যক রোগীর ওপর অসাধু পথ অবলম্বন করছে। তাই মুড়ি মুড়কির মতো ডাক্তার তৈরি নিয়ে ভাববার সময় এসেছে— যদি না তারা গ্রামের দিকে নজর দেয়।

আমেরিকার নয়া দক্ষিণ এশিয়া নীতিতে সতর্কতা পাক-চীন নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তান-চীনের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক অবস্থান নিল আমেরিকা। একদিকে আমেরিকা পাকিস্তানের সেনা অনুদানের ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কাঁটছাট করল, অন্যদিকে ভারত মহাসাগরের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক নীতি-নিয়ম মেনে চলার উপদেশ দিয়ে প্রকারান্তরে চীনকে বার্তা দিল। আমেরিকার দক্ষিণ-এশিয়া নীতির এই আমূল পরিবর্তন বিস্মিত করেছে কূটনীতিকদেরও। তাঁরা বলছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পরে ইসলামিক সন্ত্রাস নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টালেও, প্রশাসনের পরিপূরক মার্কিন সেনা বা মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সি আই এ-র অবস্থান ধোঁয়াশাজনক। আমেরিকা নিজের স্বার্থে এর আগে ইসলামি মৌলবাদকে ব্যবহার করেছে, ট্রাম্প আসার পরেও সি আই এ এই নীতি থেকে সরেছে কিনা তা স্পষ্ট নয় বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

তবে ট্রাম্পের নয়া দক্ষিণ এশিয়া নীতির পরিপ্রেক্ষিতে হাক্কানি নেটওয়ার্ক ও লস্কর-ই-তৈবার মতো জঙ্গি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের নরম মনোভাব নিয়ে রীতিমতো তোপ দাগা হয়েছে। সম্প্রতি নতুন পাক-প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সেদেশে আসেন মার্কিন উপসচিব মাইক পম্পেজ। পাকিস্তান জঙ্গি নেটওয়ার্কের নিরাপদ স্বর্গ, পাক-মদতপুষ্ট জঙ্গিরা সীমান্ত পেরিয়ে আফগানিস্তানে আক্রমণ চালায়— এই অভিযোগ আন্তর্জাতিক মহলের বহুদিনের। গত জানুয়ারিতেই মার্কিন কংগ্রেসের অনুমতি নিয়ে পেন্টাগন এই বিষয়ে সরব হয় ও একপ্রস্থ অনুদান কাটছাঁট করে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাকিস্তানকে অনুদানের ১.১৫ বিলিয়ন ডলার কমিয়ে দেয় আমেরিকা। ইতিপূর্বে গত বছরের আগস্টে ট্রাম্প যে তাঁর নতুন দক্ষিণ এশিয়া নীতি ঘোষণা করেছিলেন তাতে পাকিস্তানকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছিল যে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে এখনই ব্যবস্থা না নিলে তা বরদাস্ত করবে না আমেরিকা।

প্রসঙ্গত, পাকিস্তানকে অনুদানের আটশো মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিষয়ে নতুন করে পরিকল্পনা করছে আমেরিকার প্রতিরক্ষা দপ্তর। সূত্রের খবর এর জন্য মার্কিন কংগ্রেসের প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছেন আমেরিকার বিদেশ সচিব জিমমাট্রিস। মার্কিন সরকারের মুখপত্র কোনও ফকনারের বক্তব্য : 'অনুদান কমিয়ে পাকিস্তানকে প্রাথমিক বার্তা দেওয়া হলো। আমাদের লক্ষ্য সন্ত্রাস দমনে পাকিস্তানকে সক্রিয় করতে যে কোনও মূল্যে তাদের ওপর চাপ বজায় রাখা।'

এখন শৃঙ্খলাকে স্বৈরাচার বলা হচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ তাঁর বিরুদ্ধে আনা বিরোধীদের অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, এই দেশে কেউ শৃঙ্খলার কথা বললে তাকে স্বেচ্ছাচারীর তকমা দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি উপরাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ভেঙ্কাইয়া নাইডুর লেখা একটি বই প্রকাশ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এই কথা বলেছেন। বলা দরকার, কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী-সহ বিরোধী নেতারা প্রধানমন্ত্রী স্বেচ্ছাচারী বলে অভিযোগ তুলে আসছেন। এই সব অভিযোগের জবাব দিতে গিয়েই প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে মরীয়া হয়ে উঠেছে। তাদের এই বিশৃঙ্খলা রুখে দিয়ে কেউ শৃঙ্খলার কথা বললেই তাকে সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাচারীর তকমা দেওয়া হচ্ছে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সংসদকে অচল করে দিয়ে সমস্ত সরকারি কাজকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এখন তো শৃঙ্খলাকে স্বৈরাচার বলা হচ্ছে। শৃঙ্খলার কথা বললেই বলা হচ্ছে

অগণতান্ত্রিক। অভিধান থেকে আরও অনেক বিশেষণ বের করে এনে প্রয়োগ করা হচ্ছে।'

বিরোধীদের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংসদকে অচল করে গিয়ে সমগ্র দেশের সামনে কী বার্তা দিতে চাইছেন বিরোধীরা? নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য দেশের উন্নয়নের পথেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন তারা। সংসদ যদি সুষ্ঠুভাবে চলে, তবে কে তা পরিচালনা করছে— তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু সংসদ ঠিকঠাক না চললেই স্পিকার বা চেয়ারম্যানের দিকে সবার নজর যায়। তখনই স্পিকার এবং চেয়ারম্যানের আসল পরীক্ষা হয়। ভেঙ্কাইয়া নাইডুর প্রসংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা দেখেছি নাইডু কী দক্ষতার সঙ্গে রাজ্যসভা পরিচালনা করেন। সমগ্র দেশই তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা দেখেছে।

দিল্লিতে আর একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস আমলে ফোন ব্যাঙ্কিংয়ের তেমন প্রসার ঘটেনি। কিন্তু 'নামদারেরা' ফোনেই ব্যাঙ্কের ঋণ পাইয়ে দেওয়া শুরু করেছিলেন। যত বড় উদ্যোগপতিদের ব্যাঙ্ক ঋণের দরকার হতো, তারা নামদারদের দিয়ে ব্যাঙ্কে ফোন করিয়ে দিবেন। ব্যাঙ্কগুলিও ওই ব্যক্তি বা সংস্থাকে রাতারাতি কোটি কোটি টাকা ঋণ দিয়ে দিত। সব নিয়মকানুন, সব আইনের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল নামদার পরিবার থেকে ফোনের মাধ্যমে আসা নির্দেশ। কংগ্রেস আর তার নামদার পরিবারের এই 'ফোন ব্যাঙ্কিং' সমগ্র দেশের বিশাল ক্ষতি করেছে।

নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে দেব না : রাজনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'গণতন্ত্রে সবারই মত প্রকাশ করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু দেশের নিরাপত্তা কাউকেই বিঘ্নিত করতে দেওয়া হবে না।' একথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অপরাধে সম্প্রতি ভারভারা রাও, গৌতম নওলাখা, অরুণ ফেরেরা সহ কয়েকজন নকশালপন্থী বুদ্ধিজীবীকে মহারাষ্ট্র পুলিশ আটক করেছে। এই সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছে, 'বিরোধী কণ্ঠস্বর হচ্ছে গণতন্ত্রের সেফটি ভাল্‌ভ। সেই সেফটি ভালভটিকে যদি কাজ করতে না দেওয়া হয়, তাহলে প্রেশার কুকারটিই ফেটে যাবে।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য রাখতে গিয়েই একথা বলেছেন। রাজনাথ বলেছেন, 'আমি পরিষ্কার জানতে চাই সেফটি ভালভকে অকেজো করার কোনো বাসনাই আমার নেই। গণতন্ত্রে সবারই মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু তাই বলে কাউকে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে দেওয়া হবে না। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলিকে রক্ষা করতে আমাদের সরকার দায়বদ্ধ।'

লখনউতে একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, 'যাদের গ্রেপ্তারি নিয়ে এত হইচই হচ্ছে তাদের অতীত সম্বন্ধে একবার খোঁজ নিন। দেখবেন, এদের মধ্যে অনেককেই ২০১২ সালে একই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তখনও এইরকম হইচই ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কোনো বিশেষ মতবাদের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে হিংসা এবং সন্ত্রাসে ইন্ধন জোগানো, দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে নষ্ট করতে চাওয়া— এর থেকে বড় অপরাধ আর কিছু আছে বশে আমি মনে করি না। এইসব কারণেই তো মহারাষ্ট্র পুলিশ এদের আটক করেছে।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেন, গত কয়েক বছরে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্য পাওয়া গিয়েছে। মাওবাদী অধ্যুষিত জেলার সংখ্যা এখন ১২৬ থেকে ১০-এ নেমে এসেছে। স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মাওবাদীরা এখন নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে। তারা শহরের মানুষদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে। শহরে নানারকম হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত করতে চাইছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কাছ থেকেই এই খবর আমি পেয়েছি।

কাশ্মীর প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'কাশ্মীর একটি দীর্ঘদিনের সমস্যা। দীর্ঘদিনের একটা সমস্যাকে তো চট করে মিটিয়ে ফেলা যায় না। একটু সময় লাগে। তবে সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আমরা হিংসার সঙ্গে আপোশ করব না। কাশ্মীরে পুলিশ কর্মীদের পরিবার-পরিজনকে জঙ্গিরা অপহরণ করেছিল চাপ সৃষ্টি করতে। তবু আমরা সেই চাপের সামনে আপোশ করিনি।'

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৫

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী যুক্তানন্দ

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - অবেক্ষণ।। সুমিত্রা ঘোষ— কুসুম কুমারী
জিষ্ণু বসু—হাতি ঘোড়া পাল কী

উপন্যাসোপম কাহিনি

প্রবাল চক্রবর্তী - মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

গল্প

এষা দে, রমানাথ রায়, শেখর বসু, সিদ্ধার্থ সিংহ, সন্দীপ চক্রবর্তী
গোপাল চক্রবর্তী, তাপস অধিকারী

ভ্রমণ

কুণাল চট্টোপাধ্যায়— রেনেসাঁর ভূমিতে

জীবন-কথা

জহর মুখোপাধ্যায় - মশাল হাতে সিংহ পুরুষ

প্রবন্ধ

ডা: অমূল্যরতন ঘোষ, অচিন্ত্য বিশ্বাস, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, জয় সেন, দেবীপ্রসাদ রায়, সারদা সরকার, সুদীপ বসু, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত কুশারী, সৌমেন নিয়োগী

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

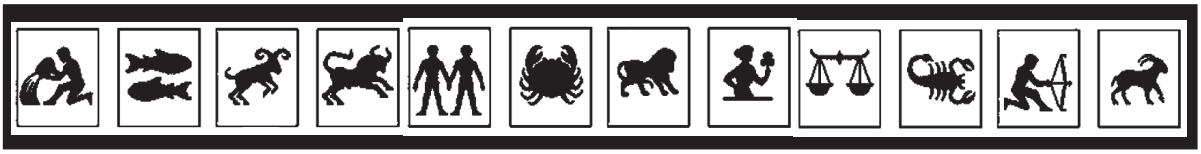

১০ সেপ্টেম্বর (সোমবার) থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে কর্কটে রাহু, সিংহে রবি-বুধ, তুলায় বৃহস্পতি-শুক্র, ধনুতে শনি, মকরে মঙ্গল-কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র সিংহে পূর্বে ফাল্গুনী থেকে বৃশ্চিকে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে।

মেষ : কর্ম ও বিদ্যাজনিত শুভ। সন্তানের সাফল্যে আনন্দ, ছলনাময়ীর কারণে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ। অপ্রত্যাশিত স্বাচ্ছন্দ্য ও গৃহ-সুখ। বয়স্ক প্রতিবেশী ও অগ্রজ ভ্রাতার সার্বিক শুভ। শেয়ার-পৈতৃক ব্যবসায় বিনিয়োগে বিত্ত ও আভিজাত্য বৃদ্ধি। যুবক বন্ধুর পীড়াদায়ক ব্যবহার।

বৃষ : রাজনীতি যুক্ত ব্যক্তিদের দুশ্চিন্তা-ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবনা। চিন্তা-ভাবনায় দৃঢ়তার অভাব বা দোদুল্যমানতা যোগ, দৈব-দুর্ঘটনা ও কথাবর্তায় সংযম দরকার। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি। দূর দেশে ভ্রমণ। বিজ্ঞান-আই টি সেক্টর ও গবেষণামূলক কর্মে জড়িতদের প্রাপ্তির ক্ষেত্র পূর্ণতা পাবে। পরোপকারে মননশীল ও সুহৃদের সাহায্য।

মিথুন : শৌখিন-বিলাস দ্রব্যের ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগের অনুকুল পরিবেশ, জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মেধা-চিন্তার স্বচ্ছতা, বাকপটুতা, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে হৃদয়ের বিকাশ। গুরুজন, দেব-দ্বিজে ভক্তি, গুণীজনের সান্নিধ্য। লাইফ পার্টনারের অমিতব্যয়িতায় মানসিক চাপ ও বিভ্রান্তি।

কর্কট : সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী ও প্রতিবেশীর সঙ্গে মতবিরোধ যোগ, নিজ বুদ্ধিমত্তায় পারিবারিক শান্তি বজায় রাখুন। বেকারদের কর্মসংস্থান যোগ, সন্তানের প্রত্যয়ী মনোভাব ও সাফল্য। রমণীর প্রতি দুর্বলতা। বয়স্কদের বিরাগভাজন।

সিংহ : কর্মক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতিতে সমঝোতা করে চলন। একাধিক উপায়ে আর্থিক যোগ, পুরানো আইনি জটিলতায় বয়স্কদের পরামর্শ কার্যকরী, বিদ্যার্থীর প্রতিভার বিকাশ ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। সমাজপ্রগতিমূলক কাজে সফল মকস্কাম।

কন্যা : শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে ও মানসিক প্রশান্তি, অপ্রত্যাশিত স্বাচ্ছন্দ্য ও গৃহসুখ। গবেষণায় অ্যাওয়ার্ড ও উচ্চশিক্ষায় আশাতীত সাফল্য। হঠাৎ প্রাপ্তি হলেও ব্যয়াধিক্য যোগ, নতুন কর্ম ও ব্যবসায় উদ্দীপনা। পৈতৃক ব্যবসা ও পিতার পরামর্শে অর্থ ও ভাগ্যোন্নতির সহায়ক।

তুলা : শরীরের যত্নের প্রয়োজন। শরীরের মধ্যাংশের অস্ত্রোপচারের সম্ভাবনা। জমি, বাড়ি, গাড়ি ক্রয়ের যোগ। ধৈর্য ও বাক্‌সংযমে প্রতিকূলতা প্রতিহত করুন। জীবনসঙ্গীর অদূরদর্শিতায় বিড়ম্বনা। সাহিত্য, সংগীত ও কলাবিদ্যায় সংযুক্তদের প্রতিভার বহুমুখী প্রসার। কর্মের যোগসূত্রে দূর দেশে ভ্রমণ।

বৃশ্চিক : সরলতা, সততা, দৃঢ়তা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, কর্তব্যপরায়ণ অনুভবী উদার দৃষ্টিতে জীবনের ঝরাপাতায় নব বসন্তের সমাহার। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপার্জনে স্বাচ্ছন্দ্য ও বর্ণময় জীবন। পিতার বৈষয়িক প্রতিভায় ধনার্জন। ব্যবসায় লগ্নি, পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির যোগ।

ধনু : উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, সরকারি সম্মান ও পত্নীর পদোন্নতি, কর্মক্ষেত্রে বদলি ও মানসিক চাপ। অন্ত্যজ শ্রেণীর সহায়তায় হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে যোগদান। আত্মীয় পরিজনের মেলবন্ধনে তীর্থভ্রমণ। দালালি, উকিল, রিপ্রেজেন্টেটিভদের বৈষয়িক সমৃদ্ধি।

মকর : সফল উদ্যোগ, কর্মে স্বাচ্ছন্দ্য-সুন্দর ও বর্ণময় জীবনের সুধাময় দৃষ্টি ও সপ্রতিভতা, বিদেশি পরিজনের সান্নিধ্য লাভ। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। ভ্রাতা-ভগ্নীর কর্মদক্ষতায় পদোন্নতি। সন্তান সম্ভবার সন্তান লাভ। সপ্তাহের প্রান্তভাগে কর্মক্ষেত্রে আকস্মিক জটিলতা ও সখ্য হ্রাস, জমি বা সম্পত্তি বিক্রয় প্রাপ্তি।

কুম্ভ : আত্মীয়, প্রতিবেশী, সহোদর সম্পর্কের উন্নতি ও সান্নিধ্য লাভ, ইলেকট্রনিক্স, ফটোগ্রাফি, প্যাথলজি, প্রযুক্তিবিদ, আই বি অফিসারদের প্রত্যয়দীপ্ত পথচলা, বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব, শংসা প্রাপ্তি। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় প্রবাস ও গুণীজনের সান্নিধ্যলাভ।

মীন : মিত্রস্থান হিতকারী নয়। প্রতিবেশীর কারণে মনঃকষ্ট, গণিত, ইলেকট্রনিক্স, অর্থনীতি, হিসাবশাস্ত্র, অধ্যাপকদের জ্ঞানের প্রসার ও মর্যাদাপর্ণ জীবন। সৃজনশীল পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। দেব-দ্বিজে ভক্তি, গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। বন্ধুপ্রীতি ও সখ্যতা লাভ। সপ্তাহের শেষভাগে মাতার অসুস্থতা যোগ।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য